প্রত্যয় ধাতু রচনাপ্রণালী প্রভৃতি। যাস্ক তাঁহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী অনেক বৈয়াকরণের বিশেষরূপে নামও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আবার সাধারণরূপে বৈয়াকরণ বা নৈরুক্ত এইরূপও বলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, সে সময়ে শব্দজ্ঞানের খুব চর্চ্চা চলিয়াছিল। কৌষীতকী ব্রাহ্মণের এক স্থান পাঠ করিয়া বেশ বোধ হয়, যে, সে সময়ে হিন্দুস্থানের উত্তরে ভাষাগবেষণা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত চলিয়াছিল।

পাণিনি।

সেই হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ব্যাকরণশাস্ত্রের জনকস্বরূপ পাণিনিরও জন্মস্থান। এখন যাস্ককে যদি বৈদিক যুগের শেষ সময়ের ধরিতে হয়, তবে পাণিনির কালকে তাহার বহুপরবর্ত্তী বলিয়া ধরিতে হইবে। যাস্কের সময়ে বাক্যের অনুরূপ শব্দ দ্বারা ব্যাকরণের কথা সকল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পাণিনির সময়ে অঙ্কের চিহ্নের ন্যায় করিয়া অর্থাৎ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সেই সব শব্দকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। উহা হইতে ইহাতে আসিতে অনেক কালের আলোচনার আবশ্যক বোধ হয়। পাণিনি নিজেই সেই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া যখন তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তখন পাণিনির পূর্ব্বেই ঐ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল জানিতে হইবে। তিনি উহার আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু ঐ প্রণালীকে পরিপক্করূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন—যাহা ব্যাকরণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

দর্শন।

ব্রাহ্মণের সমকালে এবং পরে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা অত্যন্ত উন্নতভাব ধারণ করিয়াছিল। এমন কি ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রে হিন্দুমন নিপুণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় অনেক সূক্ত পাওয়া যায়, যাহাতে করিয়া মূল কারণ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা প্রকাশ পায়, যাহাতে করিয়া জানা যাইতেছে, যে ঐ সকল আলোচনা তাহার অনেককাল পূর্ব্ব হইতে আন্দোলিত হইয়া আসিতেছে।

ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সেই খুব পূর্ব্বকালে যখন তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাটা একবার বেশ জ্বলিয়া উঠিল, তখন নানা প্রকার মত, বিশেষতঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক মত প্রবর্ত্তিত হইল। যে সমস্যা (problem) সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ় ও কঠিন তাহাই তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণেই ঐ বিষয়ের এক বা ততোধিক বিবরণ বিবৃত আছে। অনেক গ্রন্থে সৃষ্টিসম্বন্ধে নানা প্রকার মতের অবতারণা আছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান মতভেদ স্বভাবত এই দাঁড়াইল, যে, আদি কারণ কে? প্রকৃতি কি পুরুষ—অর্থাৎ জড় কি জ্ঞান? শেষোক্ত মতটাই জয়লাভ করিল, এই জন্য ব্রাহ্মণে এই মতটাই একচেটিয়ারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিপরীত মতটাও যদিও তত সমাদৃত হয় নাই, কিন্তু তথাপি রহিয়া গেল। কালে সেই মত যখন অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহা বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইল।

ষড়্দর্শন।

বৈদিক কালে দর্শনশাস্ত্র প্রণালীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় নাই, পরে যেমন ষড়্দর্শন প্রণালীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উপনিষদে অসম্বদ্ধ মত ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। যদিও সেই সকল আলোচনাকে বিভক্ত ও প্রণালীবদ্ধ করিবার রীতি দেখা যায়, তথাপি ঐ সকল অনুসন্ধানের পরিসর অতি পরিমিত। আরণ্যক উপনিষদে প্রণালীবদ্ধ করিবার ও বিস্তার করিবার ভাব অপেক্ষাকৃত বেশী। যে উপনিষদ স্বতন্ত্র দণ্ডায়মান, তাহাতে আরও বেশী। আর, যে উপনিষৎ অথর্ব্ববেদের তাহাতে দার্শনিক প্রণালী সম্যকরূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু আসল যে দর্শনশাস্ত্র, যাহাকে ষড়্দর্শনসূত্র বলে, তাহা যে, ইহার অনেক পরে, তাহা নিম্নলিখিত কারণে বেশ প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমত যে সকল ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সে সকলেতেও ষড়্দর্শন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম উল্লেখ নাই, যদিও থাকে তাহা অন্য সম্বন্ধে. দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে নয়। দ্বিতীয়ত,ষড়্দর্শনের ভিতর যে সকল ঋষিদিগের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের সঙ্গে, শেষাশেষি মাত্র কল্পসূত্র সকলে যে সকল ঋষির নাম করা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে, আংশিক ঐক্য আছে। তৃতীয়ত সমস্ত ষড়্দর্শন অবিভাগে, সংহিতা ব্রাহ্মণ উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থসমূহকে সমগ্ররূপে একবেদ বলিয়া বলে এবং নির্দ্দেশ করিবার (reference) সময় আমাদিগের নিকট যে সকল উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয় এমন কি অথর্ব্ববেদের উপ-নিষৎ সকলকে নির্দ্দেশ করে। আর রচনাপ্রণালীও এমনি অল্পের মধ্যে বহুজ্ঞাপক, আর এত সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা (technicel terms)—যদিও ব্যাকরণের ন্যায় অতদূর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি এমন স্পষ্ট ব্যঞ্জক (precision) এবং আদ্যন্তসুন্দর, যে, উহা অনেক পূর্ব্ব হইতে বিশেষরূপে অভ্যাসের বিষয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এইজন্য ইহা বৈদিক কালের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

জ্যোতিষ।

বৈদিক সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে জ্যোতিষ ও বৈদ্যশাস্ত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ না বলিয়া শেষ করা যায়

না। যদিও তদানীন্তন কালের এই দুই বিষয়সম্বন্ধীয় বহুল পুস্তক ইদানীন্তন প্রচার নাই। কিন্তু সে সময় ইহার খুব চর্চ্চা ছিল। উভয়ই কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন হইতে প্রথম উচ্ছ্বাস (impulse) প্রাপ্ত হইয়াছিল। কল্পে কল্পে যজ্ঞানুষ্ঠানের কাল নির্ণয়ার্থে, প্রাতঃ ও সন্ধ্যার হোমের জন্য, দর্শপৌর্ণমাসীর জন্য এবং তিন ঋতুর প্রারম্ভে হোমযাগের জন্য, নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হইত, যদিও তাহা অত্যন্ত সামান্য মাত্র ছিল। বাজসনেয়ি সংহিতাতে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে নক্ষত্রদর্শকদিগের বিষয় এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার কথা বিশেষ করিয়া বলা আছে। আর চন্দ্রের অষ্টাবিংশ অবস্থানের বিষয় খুব পূর্ব্বে অবগত ছিল। তৈত্তিরিয় সংহিতাতে তাহাদের আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ আছে। যে পরম্পরায় তাহাদের উল্লেখ আছে, সে পরম্পরা ২৭৮০ হইতে ১৮২০ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্বে থাকিতে পারে; তাহা হইলে তৈত্তিরীয় সংহিতা সেই সময়ের হইবার সম্ভাবনা। —সংহিতা না হউক সেই সকল শ্রুতি। তাহা এখনকার তিন চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্বে। জ্যোতি নামক গ্রন্থে যে নক্ষত্রপরম্পরা আছে, তাহা হইতেছে ভরণীশ্রেণী, তাহাতে ১৮২০—৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব বৎসর পাইতেছি। আর আর বিষয়ে বড় একটা উন্নতি দেখিতে পাই না। চন্দ্রের গতি আলোচনা করিতেন, কতকগুলা ধ্রুব তারা, সৌর-অয়ন (solstice), ইহাই কেবল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ।

শারীর সংস্থান তাঁহাদিগের জানিতে হইত, কারণ যজ্ঞে যে সকল পশুবলি হইত, তাহাদিগের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিতে হইত এবং ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে বাটিয়া দিতে হইত। পাশব শরীর-সংস্থান তাঁহাদিগের বিশিষ্টরূপে জানা ছিল, কারণ যখন দেখা যাইতেছে পশুদেহের প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা ছিল।

ভৈষজ্যবিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় অথর্ব্ববেদে রোগের উপর এবং আরোগ্যকারী উদ্ভিদের উপর প্রশংসাসূচক ঋক্ প্রচারিত আছে, আর বড় কিছু পাওয় যায় না। *

——

প্রচারক্ষেত্র।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

কুরু-পাঞ্চাল দেশে বুদ্ধের আবির্ভাব-কালেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আধিপত্য কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। উহার পশ্চিমে মথুরা অঞ্চলে বাসুদেবপ্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মই সমধিক বলবান। ঐ অঞ্চলের পূর্ব্বসীমা হইতে অঙ্গরাজ্য পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড আজীবক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ স্ব স্ব প্রচার-ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিলেন।

বুদ্ধের প্রচারক্ষেত্র কোশল হইতে অঙ্গ এবং কপিলবস্তু হইতে অবন্তিরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। * তৎকালে এই অঞ্চলের প্রধান রাজ্য ছিল, মগধ, কোশল, লিচ্ছবি, বৎস এবং অবন্তি। † এই পাঁচটি ব্যতীত, শাক্য, কোলিয়, মল্ল প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাজ্যও বিদ্যমান ছিল।

বুদ্ধের সাধনক্ষেত্র মগধের তৎকালীন অধিপতি রাজা বিম্বিসার ছিলেন গুণগ্রাহী রাজা। অগ্নিপূজক কশ্যপ, জৈনধর্ম্মব্যাখ্যাতা মহাবীর স্বামী প্রভৃতি সকল জ্ঞানাচার্য্যগণই তৎকর্ত্তৃক সমাদৃত হন। বুদ্ধের সহিত মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি মহাবীর স্বামীরই মতানুসরণ করিতেন। তাঁহার রাজধানী রাজগৃহই বুদ্ধের প্রধান লীলাস্থলরূপে বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে বহু বিভিন্ন মতাবলম্বী সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক-সম্প্রদায় বাস করিতেন।

কোশল-রাজ্যে বিম্বিসারের সমসময়ে প্রবল প্রতাপ প্রসেনজিৎ সিংহাসনাধিরূঢ়। ধর্ম্মে ও আচারে কোশলান্ ও শাক্যগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কোশল এই সময়ে বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র। সকল প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তাই রাজধানী শ্রাবস্তী-নগরে স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পান। জড়বাদী অজিতকেশকম্বল, সপ্তশাশ্বতবাদী ককুদকাত্যায়ন, আজীবক মস্করি গোশাল (মজ্ঝলি গোশাল), ভাগ্যবাদী পূরণকশ্যপ, অজ্ঞেয়বাদী সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্র (সঞ্জয় বেলট্ঠি পুত্ত) এবং জৈনমতাধিনেতা মহাবীর স্বামী এই ষট্তীর্থিক তখন শ্রাবস্তী নগরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তবে জৈনধর্ম্মই সমধিক বলবান্। অন্যান্য তীর্থিকগণের মধ্যে একমাত্র আজীবক মজ্ঝলি গোশালই মহাবীরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ। আদর্শ নৃপতি প্রসেনজিৎ কাহারো প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেন না। কালের ধারা অনুযায়ী তিনিও নূতন নূতন মতবাদের মূল্য নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা সমুৎসুক।

লিচ্ছবীয় শাসনযন্ত্র গণতান্ত্রিক। বৈশালী ইহার রাজধানী। অষ্টরাজবংশের অধীন অষ্টবিভাগের সমবায়ে এই গণতান্ত্রিক রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অষ্ট-

* 'Weber's History of Indian Literature' অবলম্বনে প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বের রচনা।

* অযোধ্যা হইতে ভাগলপুর এবং নেপালপ্রান্ত হইতে বিন্ধ্যাগিরি পর্য্যন্ত।

† মগধ—দক্ষিণ বিহার; কোশল—অযোধ্যা; লিচ্ছবি রাজ্য—উত্তর বিহার; বৎস—বুঁদেলখণ্ড (এলাহবাদ পর্য্যন্ত); অবন্তি—মালব এবং মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ।

কুলের মধ্যে লিচ্ছবি, বিদেহী বজ্জি ও জ্ঞাতৃকগণই সমধিক প্রসিদ্ধ। জৈনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বর্দ্ধমান মহাবীর এই জ্ঞাতৃকবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র লিচ্ছবিরাজ্য ইতিপূর্ব্বে জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক (?) পার্শ্বনাথস্বামীর মত গ্রহণ করিয়াছিল। মহাবীর কালবশে জীর্ণ জৈনধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিলেন। বুদ্ধ যখন প্রচার আরম্ভ করিলেন তখন লিচ্ছবি, মগধ ও কোশলরাজ্যে মহাবীরের অনুশাসনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান।

বৎস-(বংশ) রাজ্যের রাজা এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ উদয়ন। অবন্তি-রাজকুমারী বাসবদত্তার সহিত তাঁহার বিচিত্র প্রেমসম্বন্ধ ও পরিণয়কাহিনী চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। * উদয়ন উচ্ছৃঙ্খল, যথেচ্ছাচারী। কোশাম বা কৌশম্বী নগর † তাঁহার রাজধানী।

প্রতাপশালী রাজা মহাসেন চণ্ডপ্রদ্যোত এই সময়ে অবন্তি-রাজ্যের অধীশ্বর। অত্যাচারী পরপীড়ক এই চণ্ডরাজের ভয়ে পাশাপাশি রাজ্যসমূহ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। উদয়নের পৌরুষ-অর্জ্জিত পত্নী বাসবদত্তা ইঁহারই দুহিতা। উজ্জয়িনী নগরী অবন্তিরাজ্যের রাজধানী।

শাক্যরাজ্য কপিলবস্তু হিমালয়মূলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ‡ ইহার শাসনপ্রণালী গণতান্ত্রিক। শাসন-সংসদের অধিনায়ককে "রাজা" বলা হয়। বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদনই এই সময়ে কপিলবস্তুর রাজা।

কোলিয় কপিলবস্তুরই অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। শাক্য ও কোলিয়গণ সমজাতীয়। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পত্নী মহামায়াও মহাপ্রজাপতি কোলিয়রাজ অনুশাক্যের কন্যা। অনুশাক্যের পুত্র সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরাই গৌতমের পরিণীতা ভার্য্যা। §

মল্লরাজ্যও গণতান্ত্রিক। ‖ কুশীনগর এই মল্ল-রাজ্যেরই প্রধান নগর।

এতদঞ্চলে এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহু গণতান্ত্রিক রাজ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। নানা ধর্ম্ম, নানা মতবাদের লীলাক্ষেত্র বলিয়া এই অঞ্চলের লোকজন পরিবর্ত্তন-বিরোধী নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও এইভাগে যথেষ্ট আধিপত্য। বহু যজ্ঞাচারী ব্রাহ্মণের এই অঞ্চলে বাস।

* সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে ইহা একটি সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। স্বপ্ন-বাসবদত্তা ইত্যাদি এই কাহিনী অবলম্বনেই লিখিত। পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের আধুনিক নাটিকা 'জয়শ্রী'ও (বঙ্গভাষায়) এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি।

† এলাহাবাদের সন্নিকটে।

‡ নেপালের তরাই অঞ্চলে শাক্যরাজ্য অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের জন্মস্থানে নির্ম্মিত মহারাজ অশোকের রুম্মিন্‌দি-(লুম্বিনী) লিপি এই স্থানেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

§ সুপ্রবুদ্ধ অনুশাক্যের পুত্র কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে।

‖ গোরক্ষপুর অঞ্চল।

কিন্তু ঔপনিষদ আন্দোলনই সমধিক প্রবল। ইতিপূর্ব্বে বিদেহ-রাজ্য (জনকের রাজ্য) এই আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। * ফলতঃ এই ঔপনিষদ আন্দোলনই এতদ্দেশের বিভিন্ন মতবাদ ও মতবাদার জন্ম দিয়াছে। বৈদিক ও অবৈদিক সমস্ত দলের সহিতই বুদ্ধের শক্তি পরীক্ষা করিতে হইল—সসৈন্যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এইস্থানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। তৎকালে এতদঞ্চলে সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল জৈনধর্ম্ম ও আজীবক ধর্ম্ম। ইহা সত্ত্বেও তথাগত-প্রচারিত ধর্ম্মও অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করিল। এই তিন ধর্ম্মই "অহিংসাবাদী"। প্রাচ্য দেশে এই সময়ে অহিংসাবাদের এত সমাদরের কারণ ছিল। মগধ, কোশল, অবন্তি ও বৎসদেশের রাজগণের মধ্যে এই সময়ে স্বরাষ্ট্রবিস্তারের একটি প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধাবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই কাশী ও বিদেহ অঙ্গ ও বৎস, এবং অঙ্গ ও মগধ প্রভৃতি দেশের নৃপতি-গণের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছিল। বুদ্ধের প্রচারারম্ভের পূর্ব্বেই কাশী ও অঙ্গরাজ্য রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া যথাক্রমে কোশল ও মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপশালী রাজ-গণের পররাষ্ট্রাধিকারে লোলুপ তৃষ্ণা প্রাচ্যভূখণ্ডকে নিরন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া রাখিয়া দেশব্যাপী অনাবিল রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়াছিল। এই সময়ে "অহিংস ধর্ম্মের" সমাদর মনোবিজ্ঞানসম্মতই। গোশাল, মহাবীর ও বুদ্ধের বাণী লোকমনের রুদ্ধ ভাবকে ভাষা দান করিয়া জনপ্রিয় হইল বটে, কিন্তু তাহা রক্তস্রোত বন্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। বুদ্ধের জীবনকালেই মগধ ও কোশল এবং মগধ ও লিচ্ছবি দেশের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ-যজ্ঞ চলিতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই লোক-সন্ত্রাসী পশুযজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ—কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, মগধরাজ অজাতশত্রু (বিম্বিসারের পুত্র) ও লিচ্ছবিগণ—সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জৈনধর্ম্মও স্বীকার করিতেন। এই বিগ্রহ থামিতে না থামিতেই আমরা দেখিতে পাই কোশলরাজের পুত্র বিড়ূড়ব (বিরূধক) কর্ত্তৃক শাক্যবংশের ধ্বংস। রাজ্য-লোভী রাজগণ সম্বন্ধে যাহাই সত্য হউক না কেন, তখনকার জনসাধারণের মনে নিশ্চয়ই এই অবিশ্রাম যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়ার ভাব জাগিয়া-ছিল। আজীবক ও জৈনধর্ম্ম যখন এই কারণে পরম সমাদর লাভ করিয়াছে, বুদ্ধও তাঁহার মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত ধর্ম্মবাদ লইয়া ঠিক এই সময়েই ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন।

---

* বৃহদারণ্যক দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালী কবি ও বিদেশী সমালোচক।

(শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ বি-এল)

রামশর্ম্মা ও দত্তকবি।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল বাঙ্গালী কবি ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নবকৃষ্ণ ঘোষ সর্ব্বপ্রধান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নবকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার সমসাময়িক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের নিকট 'রামশর্ম্মা' নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কাব্য-গ্রন্থের সম্পাদক ও সংক্ষিপ্ত জীবনী-লেখক শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় বলেন,—রামশর্ম্মার প্রবন্ধাদি ইংলিশম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, রইস ও রায়ত, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ সাদরে গ্রহণ করিতেন। রামশর্ম্মার রচিত কবিতাবলীর বিশদভাবে সমালোচনা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ১৯১৯ সালে দেবেন্দ্র বাবু কবির রচনাবলী একত্রিত করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে ইংরাজী কাব্যশিল্পে রামশর্ম্মার নৈপুণ্য সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনাই আশা করা যায়। মিঃ ডান্ (Mr. Thoodore Douglas Dunn) "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় রামশর্ম্মার কবিতার যে সমালোচনা বাহির করেন, তাহার মূল্য সেইজন্য সমধিক নহে। এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমালোচক একাধিক স্থানে ইংরাজী কবিতারচয়িতা বাঙ্গালী কবিদিগের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের রচিত অধিকাংশ কবিতায় ভারতবাসীর হৃদয়স্পন্দন অনুভূত হয় না। অথচ, এই সকল কবির মধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের রচনায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য অসংখ্যবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। "Their work is limited in conception and contributes little to the understanding of the Indian mind"—অধ্যাপক টম্‌সনের (Prof Thomson) সমালোচনাও অনেকটা এই সুরে বাঁধা। এমন কি, তিনি রবীন্দ্র-নাথেরও কাব্যে পাশ্চাত্য ভাবের ভেজাল আছে, একথা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

বিদেশীর পক্ষে অনেক সময়ে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর রচিত কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। এতদ্ব্যতীত, স্বজাতি ও স্বশ্রেণীর কবিবিশেষ যদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হন, তাহা হইলেও অনেক সময়ে দেখা যায় যে, সহৃদয়তার অভাবে সমালোচক কবির রচিত কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবের মর্ম্ম সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন ও ইহার ফলে সমালোচনা-ক্ষেত্রে বিসদৃশ অভি-মতই জন্মলাভ করে। বিদেশী সমালোচক সেই-জন্য হিন্দু কবির যথার্থ হৃদয়ভাব অনেকস্থলে আদৌ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যেস্থলে কতকটা পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, সেস্থলে সমালোচকের মনস্তত্ত্ব তাঁহার নিজের যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমালোচকের নিজের মতের সহিত কবির আদর্শের যতটুকু ঐক্য আছে ততটুকু ছাড়া তাঁহার সমালোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। জাতি ধর্ম্ম ও দেশভেদে এক-ই কবির সমা-লোচনা বিভিন্ন অভিমত প্রসব করিয়াছে দেখা যায়। তরুদত্তের ন্যায় রামশর্ম্মার আদর্শ সম্বন্ধেও সেইজন্য সমালোচকগণ অল্পবিস্তর ভ্রমের বশীভূত হইয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু গ্লাসগো (Glassgow) হইতে প্রকাশিত "সেণ্ট এণ্ড্রু" (Saint Andrew) নামে ধর্ম্ম ও সমাজোন্নতিমূলক পত্রিকায় ১৯০৩ সালে রামশর্ম্মার কাব্য সম্বন্ধে প্রকাশিত সমালোচনা কবির রচিত কাব্য-গ্রন্থের প্রস্তুতিতে সন্নিবেশিত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সহৃদয় বিদেশী সমালোচক হিন্দু কবির আদর্শসম্বন্ধে প্রশংসা ও তাঁহার কাব্য-শিল্পের যথার্থ ব্যাখ্যা অকপটে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। উক্ত সমালোচনায় রাম-শর্ম্মাকে "লাইট্ অব্ আসিয়া"র (Light of Asia) কবি এড্‌উইন্ আর্‌নল্ডের (Edwin Arnold) সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

রামশর্ম্মা "শিবরাত্রি" ও "ভগবতী-গীতা" ব্যতীত "রাজকুমারী লীলার স্বয়ম্বর" ও "দক্ষযজ্ঞের" নামে দুইটী উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘ ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। "শেষদিন" (The Last Day)—আর একটী উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট দীর্ঘায়তন ইংরাজী কবিতা। রামশর্ম্মার যশ তাঁহার জীবনকালে অসংখ্য রাজনৈতিক কবিতার ভিতর দিয়া দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেও ধর্ম্মসমাজ ও নৈতিক জগত সম্বন্ধে এই নিষ্ঠাবান হিন্দুর রচিত ইংরাজী কবিতায় যে আমরা ভারতীয় আদর্শের রীতিমত পরিচয় পাই তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। রামশর্ম্মা স্বরচিত বিস্তর ইংরাজী কবিতার মারফৎ তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণকে সততা ও ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সদুপদেশ দান করিতে কোনও সময়ে বিরত ছিলেন না। ইংরাজী ভাষার হিন্দু কবিগণের মধ্যে কেবল এক রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত ব্যতীত অপর কোনও হিন্দু কবি রামশর্ম্মার সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইংরাজী ভাষার এই দুইজন বাঙ্গালী কবির রচনায় উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য আদর্শজাত প্রভাব আমরা সর্ব্বত্র অনুভব করি সত্য, কিন্তু তাঁহারা পাশ্চাত্য

আদর্শকে আদৌ গোলামের মত অনুসরণ বা অনুকরণ করেন নাই, তাহার তীব্র আলোকে একালের হিন্দু ও হিন্দুস্থানীর দুরবস্থা কবিতার পর কবিতার ভিতর দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন মাত্র। রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্তের রচিত ও তিন সর্গে সমাপ্ত সুবিখ্যাত ইংরাজী কাব্য "সুমেরুর স্বপ্ন" (A Vision of Sumeru) আগাগোড়া পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। কবিকে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এস্থলে "সুমেরুর স্বপ্নে"র আখ্যানবস্তু সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

সুমেরুর শিখরে ব্রহ্মার আলয়ে যেদিন সৃষ্টিকর্ত্তা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পবনদেবকে বলিলেন, "যাও, দেবগণকে এখানে ডাকিয়া আন", সেদিন তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দেবী সরস্বতীও ভীতা হইয়াছিলেন। পবনদেব কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ও স্বর্গে অনতিবিলম্বে গমন করিয়া শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে ব্রহ্মার আদেশে সুমেরুতে উপস্থিত হইতে বলিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"পৃথিবী হইতে পূজা ও দেবগণের প্রীত্যর্থে বলি আমরা পাইতেছি না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।" শিব ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বলিলেন,—"কাশী ও কামরূপে ত তাঁহার পূজা নিত্য হইতেছে।" কালী, লক্ষ্মী ও উমা প্রত্যেকেই বলিলেন যে, তাঁহাদের পূজা সম্বন্ধে নরলোকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নাই। বিষ্ণু কহিলেন,—"পুরীধামে তাঁহার পূজা নিয়মিতরূপে হইতেছে।" ব্রহ্মা দেবতাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আমি বিপদের আশঙ্কা করি, মর্ত্ত্যের অধিবাসীরা বোধ হয় আমাদের শত্রু বিদেশী দেবগণকে ভজনা করিতেছে।"

"At other shrines they kneel,
Perchance to gods of foreign birth,
Some alien enemy."

শিব ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বিদ্রূপ সহকারে বলিলেন, "আমাদের পূজা সকলেই করিয়া থাকে। আপনাকে কেহ পূজা করে না, আর সেইজন্য ঈর্ষান্বিত হইয়া আপনি এই সকল বৃথা বাক্য শুনাইতেছেন।" প্রজাপতি তখন ক্রোধকে দমন করিয়া বলিলেন,—"থাম, থাম, তোমার মত কলহপ্রিয়, চরিত্রহীন দেবতা কেহ নাই। আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকর্ত্তা, আমিই এই সীমাহীন জগতের একমাত্র অধীশ্বর। দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যেও তুমি আমার শাসন উপেক্ষা করিতে অক্ষম। এইরূপে দেবগণের মধ্যে ধ্বংসকারী যুদ্ধের সূচনা হইতেছে দেখিয়া গণেশ ব্রহ্মা ও শিবকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক, তাঁহারা মর্ত্ত্যের সঠিক সংবাদ দিতে পারিবেন।" সাক্ষীগণ একে একে আসিয়া বলিলেন যে, বিদেশী দেবতারা মর্ত্ত্যে পূজা পাইতেছেন ও মানবগণ প্রাচীন দেবতাদিগের সম্বন্ধে এমন অকথ্য মিথ্যা রটনা করিতেছে যে, পুরাকালে অসুরেরাও সেরূপ করিতে সাহসী হইত না। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব তখন আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পৃথিবীকে সেই মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিবার প্রস্তাব করিলেন। বিষ্ণু শিবকে শান্ত হইতে বলিলেন, এবং শেষে ব্রহ্মার উপদেশমত মরুৎ সুমেরু হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন। পবনদেব যতক্ষণ না মর্ত্ত্যলোক হইতে সংবাদ আনয়ন করেন ততক্ষণ দেবতারা আমোদ-আহ্লাদে রত রহিলেন।

প্রথম সর্গে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া কবির কল্পনা নিশাযোগে পবনদেবের সহিত মর্ত্ত্যে আগমন পূর্ব্বক কৈলাস, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী প্রভৃতির শোভা দর্শন করিয়া হিমালয়ের এক গুহায় ভৈরবীর সহিত মিলিত হইল। ভৈরবী পবনদেবকে তাহার জীবনের গোপনীয় কথা শুনাইল। তাহার পাপজীবনের কাহিনী খুলিয়া বলিয়া পবনদেবকে জানাইল যে, কেন সে ভৈরবী সাজিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভৈরবী বলিল,—কিছুদিন হইতে এখানে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। বদ্রীনাথ, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থে যাত্রীর সংখ্যা কমিল কেন? মানুষ কি নিষ্পাপ হইয়াছে? দেবতারা কি শক্তিহীন হইয়াছেন? ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছগণের আগমনে লোকে দেবগণের প্রতি ভক্তিশূন্য হইয়াছে। তাহারা কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রুশ পূজা করিতেছে, কিংবা বর্ব্বরতার পরিচায়ক নানা প্রকার কুসংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া প্রাচীনতম সত্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নৃশংসতার দাস হইয়াছে। আপনি যদি হরিদ্বারের পথে ভারতের সমতল প্রদেশে গমন করেন, তাহা হইলে সেখানে দেখিবেন যে, মন্দিরের আশে পাশে চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসঘাতকেরা দেবতা ও মানুষকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রাহ্মণগণ সেখানে দর্প সহকারে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিলেও নির্লজ্জভাবে স্বধর্ম্মত্যাগী অনাচারী হিন্দুর দান গ্রহণ করে, দণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ভণ্ডগণ পঞ্চ-মকারের সেবা করে।

অতঃপর পবনদেব পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া অসংখ্য তীর্থস্থান দর্শন করিলেন। কিন্তু সকল স্থানেই ভগবানের নাম ও মাহাত্ম্যের ভীষণ চীৎকার-শব্দে

ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনে বলিলেন, দেবতারা এই প্রকার মৌখিকতা চাহেন না। ইহা ত পূজা নহে, এরূপ পূজা না হয়,—তাহাও শ্রেয়! ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিয়া পবনদেব দেখিলেন, এক ব্যক্তি ভক্তিভরে রুদ্ধস্বরে নির্জ্জনে জানুর উপর ভর করিয়া প্রার্থনা করিতেছে। প্রার্থনার শেষ শ্লোকে পবনদেব শুনিলেন,—

শিবপূজা করে তারা শক্তি লভিবারে,
বিষ্ণুপূজে ধন-আশে! শত উপচারে;
আমি ত চাহি না ধন, চাহি না শকতি,
যীশু প্রতি থাকে যেন অচলা-ভকতি।

পবনদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই যীশু কে? ব্রহ্মার সহস্র নামের তালিকায় ত এ নাম নাই! অতঃপর পবনদেব মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল ও যমুনার তটে বিস্তর মন্দির দর্শন করিলেন। এই প্রদেশেও তিনি মুক্তিকামী এক যুবককে ক্রুশের প্রভাবে যমরাজার তাড়না হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে শুনিলেন। পবনদেব মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

মুক্তিদাতা হয় যদি ক্রুশ কাষ্ঠময়,
তবে ত সে একমনে পুজিছে নিশ্চয়।
পারি যদি সুপ্ত হৃদি জাগাতে এখনি—
শুনিবে যুবক যেই সঙ্গীতের ধ্বনি;
পশিবে মরমে তার পবিত্র বারতা—
যমুনা শুনাবে কত পুণ্যময় কথা!

যুবক প্রার্থনা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পবনদেব তখন প্রয়াগ ও কাশীর দিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মে আন্তরিকতার অভাব দেখিলেন।

অতঃপর পবনদেব যখন সুমেরুতে ফিরিয়া যাইবেন, এইরূপ মনে করিতেছেন, সেই সময়ে একটি বালকের মুখে ভগবানের নাম শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগবানের নাম কি?" বালক বলিল, "যীশু বা জিহোভা।" "যীশু কোথায় থাকেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে বালক বলিল, "কোথায় তিনি নাই? সমুদ্রের তরঙ্গে, সূর্য্যরশ্মিতে, পদ্মপুষ্পে, নদীগর্ভে, বাতাসে, মানব-হৃদয়ে, সর্ব্বত্র তিনি আছেন। কখনও তিনি দূরে নাই।" পবনদেব জিজ্ঞাসিলেন, "কবে ও কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?" বালক বলিল, "যিনি সীমাবদ্ধ নহেন, তাঁহার আবার জন্মগ্রহণের স্থান ও সময় আছে নাকি?" এই কথা বলিয়া বালক পবনদেবকে যীশুখৃষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত ও মৃত্যুর ঘটনা শুনাইল। তারপরে মরুৎ কামরূপ গোমতী, গণ্ডক, গৌহাটি প্রভৃতি বহুস্থান ও নদনদী পরিদর্শন করিলেন। উড়িষ্যায় তিনি খৃষ্টভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সু-উচ্চ ভজনালয় দেখিলেন বটে, কিন্তু সেখানে কোনও দেবমূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইলেন না। ভক্তেরা যীশুর নামোচ্চারণ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই পবনদেব সুমেরুর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় সর্গে কবির কল্পনা আবার পাঠককে সুমেরুর শিখরপ্রদেশে লইয়া যায়। দেবগণের সভায় পবনদেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পৃথিবীতে ব্রহ্মার কোন-ও মন্দির নাই। ভারতবর্ষে শিব, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উমাকে লোকে পূজা করে বটে, কিন্তু সে পূজার কোনই মূল্য নাই,পূজার ভণ্ডামি মাত্র দেখিলাম। মন্দিরে, মঠে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নিরাপদ নহে। মানুষ ভক্তিশূন্য হৃদয়ে কেবল ধন, মান, যশ চাহিতেছে। সুবৃহৎ মন্দির-সকল সেই পাপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে যেভাবে পূজা হইত তাহার চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উপাসনার মত যদি কিছু লক্ষিত হয়, শত্রুর অধিকৃত দেশে যীশুর নামে উৎসর্গীকৃত গির্জ্জায় তাহা দেখা যায়। মর্ত্ত্যের সর্ব্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে যীশুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে। দেবতাদের পতনের কারণ যীশু। আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি ইহার প্রতীকার করিতাম। এক্ষণে আপনারা মন্ত্রণা করিয়া স্থির করুন কি কর্ত্তব্য। দেবতারা একে একে নিজেদের শক্তিমত্তার প্রশংসা করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিতে চাহিলেন। ব্রহ্মার নেতৃত্বে সুমেরু হইতে দেবতাদের অভিযান বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত উড়িষ্যার সমুদ্রবিধৌত কূলে যখন তাঁহারা পবনদেবপ্রদর্শিত যীশুর ভজনালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা সেই শান্তিময় নির্জ্জন স্থানের পবিত্রতা অনুভব করিয়া যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "তুলাদণ্ডে আপনাদের লঘুত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে, আপনাদের সাম্রাজ্য ও শাসনের অবসান হইয়াছে। বিশ্বের আত্মা যখন আদিকালে শূন্যময়তাকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তখন তাঁহার-ই আদেশে প্রকৃতি ও আপনারা মানবজগৎকে শাসন করিবার জন্য জন্মলাভ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু আপনারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন,—আপনাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর বিশ্বনিয়ন্তার আদেশে আপনা-দিগকে নরকে অবস্থান করিতে হইবে।" স্বপ্নভঙ্গে দত্তকবি বলিলেন "দেবতাদের দিন শেষ হইয়াছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' জীবনদেবতা এক্ষণে ভারতবর্ষের উপর আদি উষার আলোক ঢালিয়া যুগ-যুগান্তরের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিতেছেন। ইহা-ই আমার এই কাব্যের অন্তর্নিহিত নীতি-কথা।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' নিম্নলিখিত আকারে গৃহীত হইয়াছে :—

১। (১) এই আইনের নাম হইবে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের 'শিশু বিবাহ-নিরোধক আইন।'

(২) এই আইন সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে, ব্রিটিশ বেলুচি স্থানে এবং সাঁওতাল পরগণায় প্রবর্ত্তিত হইবে।

(৩) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১লা তারিখ হইতে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। এই আইনের মূল বিষয়ের বা কোন কথার বিরোধী না হইলে এই আইনে—

(ক) শিশু শব্দের অর্থে পুরুষের বেলায় আঠার বৎসরের নিম্নবয়স্ককে এবং নারীর বেলায় চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্কাকে বুঝাইবে।

(খ) যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদের মধ্যে কেহ শিশু থাকিলে সে বিবাহ 'শিশুবিবাহ' বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) 'বিবাহের পক্ষ' বলিতে যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(ঘ) 'নাবালক' বলিতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আঠার বৎসরের নিম্নবয়স্কদিগকে বুঝাইবে।

৩। আঠারো বৎসরের অধিক এবং একুশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক যে কোন পুরুষ শিশুবিবাহ করিবে, সে এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে।

৪। একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ শিশু-বিবাহ করিলে একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড অথবা একহাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবে।

৫। যে কেহ কোন শিশুবিবাহ নিষ্পন্ন করিবে, পরিচালনা করিবে অথবা তত্ত্বাবধান করিবে, তাহার প্রতি একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড, একহাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে, এই বিবাহ শিশুবিবাহ নহে এরূপ বিশ্বাস করিবার তাহার কারণ ছিল, তবে সে দণ্ডিত হইবে না।

৬। (১) যে ক্ষেত্রে কোন নাবালক শিশুবিবাহ করিবে, সে ক্ষেত্রে সেই নাবালকের পিতা, অভিভাবক অথবা আইনতঃ বা বে-আইনী ভাবে রক্ষক কোন ব্যক্তি যদি সেই বিবাহে উৎসাহ দেয়, অথবা সেই বিবাহে অনুমতি দেয়, অথবা গাফিলতি বশতঃ সেই বিবাহ বন্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার প্রতি একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে—প্রকাশ থাকে যে, কোন নারীই কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইবে না।

(২) এই ধারার বিহিত উদ্দেশ্যে যে ক্ষেত্রে নাবালক শিশুবিবাহ করিবে, সে ক্ষেত্রে নাবালকের রক্ষক যদি বিপরীত প্রমাণ না দিতে পারে, তবে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, সে গাফিলতি বশতঃই এই বিবাহ বন্ধ করিতে পারে নাই।

৭। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের 'জেনারেল ক্লজেস এক্টে'র ২৫ ধারায় অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬৪ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে কোন আদালত কোন অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার সময় এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন না যে, অর্থদণ্ডের টাকা আদায় না হইলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

৮। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৯০ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন আদালত এই আইনের কোন অপরাধের মামলা গ্রহণ করিতে অথবা বিচার করিতে পারিবেন না।

৯। যে বিবাহ সম্পর্কে অপরাধ হইবে সেই বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কেহ কোন অভিযোগ না করিলে কোন আদালত এই আইনের অপরাধের মামলা করিতে পারিবেন না।

১০। এই আইনানুসারে কোন আদালত যদি কোন মামলা গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২০৩ ধারা অনুসারে নালিশ ডিসমিস না করেন, তবে উক্ত কার্য্যবিধির ২০২ ধারা অনুসারে সেই আদালত স্বয়ং এই অভিযোগের তদন্ত করিবেন, অথবা সেই আদালতের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্তের আদেশ দিবেন।

১১। (১) অভিযোগকারীর জবানবন্দী গ্রহণের পর আসামীকে হাজির হইবার সমন দিবার পূর্ব্বে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৫০ ধারা অনুসারে যদি অভিযোগকারীকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সেজন্য মুচলেকাসহ বা মুচলেকা-বিহীন একশত টাকার জামীন লিখিয়া দিতে হইবে। যদি আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এই জামীন না দেওয়া হয়, তবে নালিশ ডিসমিস হইবে। আদালত ইচ্ছা করিলে এই জামীন না লইতেও পারিবেন, সেক্ষেত্রে জামীন না লওয়ার কারণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(২) এই ধারা অনুসারে যে জামীন লওয়া হইবে, তাহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির অনুসারে গৃহীত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত কার্য্যবিধির ৪২ ধারা প্রযুক্ত হইবে।

আইনের উদ্দেশ্য

আইনটির উদ্দেশ্য বর্ণনায় শ্রীযুক্ত শারদা বলেন :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষে এক বৎসর বয়সের কম বয়স্কা ৬১২টি, পাঁচ বৎসরের কম বয়স্কা ২০২৪টি, দশ বৎসরের কম বয়স্কা ৯৭৮৫৭টি এবং পনের বৎসরের কম বয়স্কা ৩৩২০২৪টি হিন্দু বিধবা ছিল। হিন্দুর আচার ও প্রথার ফলে এই সমস্ত শিশু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে না, ইহাই দুঃখের কথা। পৃথিবীর সভ্য কি অসভ্য অন্য কোন দেশেই এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখা যায় না। সামাজিক রীতির এই সমস্ত অসহায়া নিপীড়িতাদিগকে উদ্ধারার্থ আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সামাজিক রীতির আবশ্যকতা পুরাকালে যাহাই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে যে উহা কালোপযোগী নহে, বরং অনেক অনিষ্ট এবং ক্ষতির কারণ হইতেছে, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আনন্দবাজার—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

(ডাঃ শ্রীব্রজবল্লভ সাহা এম-বি, পি-এইচ. ডি)

সুইডেন দেশে রাজার ঝিয়ারি নাম তাঁর ইউজিনি,
নিরমিলা এক আতুরনিবাস বেচি' আভরণ-মণি।
কতনা রোগের মসীঢালা দেহে ফিরিল বিমল বিভা
নিশি দিশি সেথা লভিয়া দরদী মায়ের মতন সেবা।
একদিন সেই দেবীর সকাশে বিদায় লইতে আসি'
রোগী একজন আনত আননে রহিল নীরবে ভাষি'।
ভাবের আবেগে কথা না জুয়ায় ঝরঝর্ আঁখি ঝুরে,
দেবী কহে এ যে ভূতলে অতুল মণি এল মোর ফিরে।
খনির মণিতে শোভিত এদেহ যাহা হয়ে যাবে মাটি
হৃদয়-সায়র-মথিত রতনে ভূষণ মিলিল খাঁটি।

নানা কথা

পর্দ্দা ও মুসলমান সমাজ—গত ১ নবেম্বরে এলাহাবাদে মুসলমান মহিলাদিগের এক সভা হইয়াছিল। সভা হইয়াছিল মাননীয় জষ্টিশ সুলেমানের গৃহে এবং সভানেত্রী হইয়াছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাড-ভোকেট সেখ আবদুল্লা মহাশয়ের পত্নী। সভানেত্রী সেই সভায় মুসলমান মহিলাদের মনোগত ভাবপ্রকাশে নির্ভীকতার প্রয়োজন বলিয়া বলিলেন যে, প্রকৃত ইসলামধর্ম্মবিহিত পর্দ্দার তিনি বিরোধী নন; কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতে প্রচলিত পর্দ্দাপ্রথা উক্ত ইসলামী পর্দ্দাপ্রথা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলামী পর্দ্দার বিধানে ইংরাজ ও মার্কিণ রমণীসমাজে প্রচলিত পদ্ধতির মত মুসলমান স্ত্রীলোকদের অপরিচিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে মেলামেশা নিষিদ্ধ। কোরাণের আদেশ অনুসারে মহিলাদের বাহিরে যাইবার সময় অবগুণ্ঠিত হওয়া উচিত, কিন্তু তাঁহাদিগের ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকা সমর্থন করে না। হিন্দু মহিলাদিগের সম্বন্ধে আমরাও অনেকটা ঐ কথা বলি। তাঁহারা যদি বৈদিক সময়াবধি প্রচলিত স্বাধীনতার সঙ্গে অবরোধ প্রথা অবলম্বন করেন, তবে বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগের দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহারের সমস্যা অনেকটা সহজে নিরাকৃত হইতে পারে এবং নারীধর্ষণের প্রতীকারেরও সহজ ব্যবস্থা হইতে পারে।

অশ্লীল সাহিত্য—সেদিন ৫।১২।২৯এর ষ্টেটসম্যান কাগজে দেখি, লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুখ্য বাংলা মাসিক-পত্র "উত্তরায়" সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ পত্রে একটী অশ্লীল কবিতা প্রকাশ করিবার জন্য ২৫৲ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি কবিতাটী জরিমানার যোগ্য অশ্লীল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন! হে ভগবান! তোমার সুরক্ষিত এই পুণ্যভূমিতে এসমস্ত কি হইতে চলিয়াছে? তুমি রক্ষা কর—তুমি রক্ষা কর; তোমার রোষদীপ্ত রুদ্রদৃষ্টি সম্বরণ কর। দেশের তথাকথিত অগ্রগামী দল যে কি পর্য্যন্ত নিলজ্জ বেহায়া হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহারই অন্যতর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একবার একটা মকদ্দমায় জুরীতে ছিলাম। সেই মকদ্দমায় একজন ১৮।১৯ বৎসরের একটী ছেলে সাক্ষী ছিল। ছেলেটী সম্ভ্রান্ত ঘরের। সে যখন কাঠগড়ায় উঠিল, তখনই তো তাহার দুই গাল বহিয়া পানের পিক গড়াইতেছিল এবং সে নিতান্তই নিলজ্জ ও বেপরোয়া ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। তারপর জেরায় সে যখন নিজের দুশ্চরিত্রতার কথা অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল, আমরা তো তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার অন্তরে দুঃখ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশ বাবুরও এই কার্য্যে বর্ত্তমান তরুণসমাজের মতিগতি উপলব্ধি করিয়া আমাদের হৃদয় তো ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই "উত্তরা" কাগজেই একটী ভয়াবহ অশ্লীল উপন্যাস বাহির হইতেছিল—তাহার একঅংশ "শনিবারের চিঠি"তে উদ্ধৃত দেখিয়াছিলাম। আমি জোরের সঙ্গে বলিতে পারি, সে উপন্যাস স্বামীস্ত্রীতে একসঙ্গে পাঠ করাও অসম্ভব। সেই উপন্যাস যাঁহার হৃদয় ও লেখনী হইতে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার সংসারে বেশী দিন থাকিয়া বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসীর অন্তর কলুষিত করিবার জন্য অশ্লীলতার কালকূট

পরিবেশন করিবার পরিবর্ত্তে গভীর অরণ্যে অজ্ঞাতবাস করা শ্রেয়।

নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা—প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তথাগত বুদ্ধদেব নিজ সাধনার বলে মানবহৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। কালের প্রভাবে তাঁহার উপদেশ সকল নানা সম্প্রদায়ে নানা বিকৃত আকারে দেখা দিতেছে। বর্ত্তমানে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধন উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্য "নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধমহাসভা" স্থাপন করিয়াছেন। এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় এই সভার একটী বিশেষ উৎসবের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কার্য্যে সফলতা কামনা করি।

বিলাতের দারিদ্র্য—বিলাতেও তবে দারিদ্র্য আছে! আমরা তো জানিতাম, জগতের মধ্যে দরিদ্রতম দেশ সোনার ভারত—যে ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় ২০৲ টাকা; কিন্তু সম্প্রতি কাগজে দেখি যে, বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্যও দরিদ্র হইবার অধিকার পাইয়াছেন! পার্লামেণ্টে সম্প্রতি এক যুবক সভ্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রাতরাশের পরে তাঁহার উদরে আর অন্ন পড়ে নাই। তিনি মাসে ৪০০।৫০০ টাকা যাহা পান, তাহাতে তাঁহার খরচ কুলায় না, কাজেই এই প্রতিনিধি একাহারে থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন! তবে, বিলাত তো আর তোমাদের দগ্ধ ভারতবর্ষ নহে। মাসে ৪০০।৫০০ টাকাতেও যখন কুলায় না জানা গেল, তখনই জনৈক মহিলা সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে প্রত্যেক সভ্যকে ৫০ পাউণ্ড (প্রায় ৭০০৲) জলপানী হিসাবে দেওয়া হউক! বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্যের মাপকাঠি বিভিন্ন। আমাদের দেশে অনাহারে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক না মরিলে দারিদ্র্যই বল বা দুর্ভিক্ষই বল, কিছুই ধরা যাইতে পারে না।

ইংরাজ-সৈন্য ও বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী—সংবাদপত্রে দেখি যে, কয়েকজন ইংরাজসৈন্য মজঃফরপুরের এক বালিকাবিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রীর প্রতি বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছিল (আনন্দবাজার ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এইরূপ ঘটনাসমূহেরই ফলে কত রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে, কেবল ইংরাজসৈন্য কেন, চারিদিকে যে প্রকার নারীধর্ষণের উৎপাত আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, দেশের প্রতি পল্লীর বালক ও যুবকের এবং প্রত্যেক বালিকার লাঠিখেলা, যুযুৎসু, ছোরাখেলা প্রভৃতি আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করা উচিত। আমরা যতদূর প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শ্লীলতা বজায় রাখিয়াও এই সকল শিক্ষা করা চলে। এখানে শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না, কারণ প্রথমত এই সকল শিক্ষার বিরুদ্ধে শাস্ত্রে কোন নিষেধ-বিধি দেখি নাই; কাজেই এ সকল শিক্ষা করা বা শিক্ষা না করা স্থান ও কালের প্রয়োজনমত কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য ধরিতে হইবে—বিশেষত যখন আমরা বৈদিক কাল অবধি সে দিন পর্য্যন্ত দেখি যে, ভারতরমণীগণের মধ্যে অশ্বচালনা প্রভৃতি নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। দ্বিতীয়ত, বর্ত্তমানে নারীধর্ষণ যেরূপ প্রবলভাবে চলিতেছে, ভারতের সমগ্র ইতিহাসে এমন প্রবলভাবে নারীধর্ষণ চলিতে দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ।

দীর্ঘজীবী পুরুষ—গত ৪।৮।৩৬এ জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত বাউরা-নিবাসী জয়নারায়ণ হাড়ি ১৩০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার বিধবা স্ত্রীর বয়স ১০৬ বৎসর। উক্ত হাড়ি মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বেও দুই তিন মাইল পদব্রজে চলিয়া ভিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছে। (হিতবাদী ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।)

৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রপিতামহ ৺রামজয় ন্যায়ালঙ্কার ১০৩ বৎসর জীবিত ছিলেন, (তাঁহার আত্মচরিত দেখ)।

ফেরিওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেট—শ্রীযুক্ত জে, বুথ, বিচারক (J. P.) কাউন্সিলর, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ব্যালডক (হার্টস্) বেঞ্চের ডেপুটি চেয়ারম্যান তাঁহার অবসর সময়ে ঠেলাগাড়ীতে জিনিষ লইয়া বিক্রয় করিতেছেন। তাহার ছবি গত ১৫, ১২, ২৯এর ষ্টেটসম্যান কাগজে দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইংরাজ জাতি কেন বড় হইয়াছে। তাহারা বোঝে যে, there is digniby in labour—যে প্রকার হৌক পরিশ্রমের একটা মর্য্যাদা আছে। সেদিন একটা গল্প শুনিলাম—একদিন এণ্ড্ইয়ুল কোম্পানীর বড় সাহেব সার ডেবিড ইয়ুল একবার তাঁহার বড় বাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে এক কুলি মুখে কয়লার কালী মাখিয়া, ময়লা কাপড় পড়িয়া কি কথা বলিতে সেখানে উপস্থিত হইল। কথা প্রসঙ্গে ইয়ুল সাহেব বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই কুলিকে আলিঙ্গন করিতে পার?" বড় বাবু একটু কিন্তু-কিন্তু করিতে লাগিলেন। "আমি পারি", বলিয়াই কুলিকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। এইরূপ সহৃদয়তার

কারণে এণ্ড্রুইয়ুল কোম্পানী, পি :এণ্ড ও কোম্পানী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কোম্পানী বড় হইতে পারিয়াছে। আমি কোন কথা প্রসঙ্গে ভক্তিভাজন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটেও ঐ কথা শুনিয়াছিলাম—there is dignity in labour। ভারতবাসী যেদিন এই কথাটী প্রাণের মধ্যে ধরিতে পারিবেন সেইদিন স্বরাজ হস্তগত হইতে বিলম্ব হইবে না।

নারী-হরণের প্রতীকার—সম্প্রতি জষ্টিস কষ্টেলো একটী নারীহরণের মামলার রায়ে বলিয়াছেন —"একথা ভাল রকমই বুঝাইয়া দিতে হইবে, যদি এরকম আর এভাবে (নারীহরণ) অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তবে ইহা দমন করিবার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে, এমন কি, অপরাধীকে এজন্য যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে"। আনন্দবাজার পত্রিকার ন্যায় (৪ঠা পৌষ ১৩৩৬) আমরাও এই উক্তি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। যদি এই বিষয়ের কয়েকজন অপরাধীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসে দণ্ডিত করা হয়, তবে নারীহরণের অত্যাচার অবিলম্বে থামিয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজত্বেরও জয়জকার হইবে। এই সকল নারীহরণ দেশের সর্ব্বত্র যে কিরূপ আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। সেই সঙ্গে আমরা সংবাদপত্র সম্পাদক এবং সাহিত্যিকগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, যুবকগণের অন্তরে যাহাতে কামানল ইন্ধন প্রাপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। লোকের কামানল প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তোমরা একদিকে নারীহরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধরিবে অপরদিকে অমুক থিয়েটারে অমুক অভিনেত্রী অভিনয়ের দ্বারা দর্শকগণের মনমুগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া যুবকদিগকে থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে যাইতে প্রলুব্ধ করিবে—তাহা হইলে যুবকেরা যদি কামানলে উন্মত্ত হইয়া নারীহরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন দোষ দিব কাহাকে? দেশের যে রকম অবস্থা পড়িয়াছে, তাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশে অর্থোপার্জ্জনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধ বিলাসব্যসনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হউন—জননী মাতৃভূমির অশ্রু সহজেই মুছিয়া যাইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত কষ্টেলোর উক্তি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের বিবেচক ব্যক্তিগণ একবাক্যে সমর্থন করিবেন নিঃসন্দেহ।

পত্রিকাপরিচয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত 'মহদ্বাণী' গত ১৮ অগ্রহায়ণের 'শিক্ষাসমাচারে' উদ্ধৃত হইয়াছে। যুবক ও বালকদিগের অন্তরে একটা সাধুভাব, একটা প্রকৃত জাগরণ আনিবার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহাতে দেশবাসীর সহায়তা লাভ করিলে আমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে। দেশ-নেতৃগণের দৃষ্টি এবিষয়ে পড়িতেছে দেখিলেও আমাদের আনন্দ হয়।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীমতী বাণী দেবীর "শিশুশিক্ষা সঙ্গীতের প্রয়োজন" পৌষসংখ্যার মাতৃমন্দিরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখিলে সুখী হইব।

যুবক—আশ্বিন-কার্ত্তিক—১৩৩৬—"সমস্যা ও সমাধান" প্রবন্ধটী বড়ই ভাল লাগিল—সময়োপযোগী হইয়াছে।

বঙ্গলক্ষ্মী—অগ্রহায়ণ ১৩৩৬—আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে এই পত্রিকা ৫ম বর্ষে পড়িল। বুঝা যাইতেছে, এরূপ একটী মাসিক-পত্রের প্রয়োজন আছে। মুখবন্ধ স্বরূপে "সত্যের ডাক" প্রবন্ধটী বড় ভাল লাগিল। ইহাতে বর্ত্তমানে ইউরোপীয়দিগের স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে এদেশবাসীর অনেক ভুল ধারণা কাটানো হইয়াছে। লেখক ঠিক বলিয়াছেন—"উন্মত্ত স্বাধীনতা সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়"। "অনেক হাল্কাবুদ্ধির লোক মনে করেন মেয়েদের একা ঘোরাটাই তবে (ইউরোপীয় মেয়েদের অনুকরণে) বুঝি উন্নতির পরাকাষ্ঠা।" প্রবন্ধটী প্রত্যেক গৃহে প্রচার করা উচিত। "যুগ পরিবর্ত্তনে নারীর স্থান" প্রবন্ধে শ্রীমতী শকুন্তলা রাও লিখিয়াছেন—"উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কিম্বা মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ভারতনারীর অবস্থা শোচনীয় ছিল। নারী যে একটা মানুষ, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবার যে শক্তি আছে, সংসারের বিষয় বা নিজ জীবনের বিষয় ভাবিবার মত তার যে বুদ্ধি আছে, এমন কথা ধারণারও বাহিরে ছিল"। এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এটা গতানুগতিক কথা, এবং বলিতে কি, ইহা তথাকথিত বিলাতী ঐতিহাসিক-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। আমরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে, এদেশের সমাজে নারীকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইত এবং তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব প্রবল ছিল বলিয়াই আজও হিন্দুধর্ম্ম ও আর্য্য-শিক্ষা পাইয়া আমরা ধন্য হইতেছি।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—গত ২২শে পৌষ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ সার্দ্ধ ১০ ঘটিকায় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বার্ষিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে তদীয় পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বালিগঞ্জের বাসভবনে একটী পারিবারিক উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের পুষ্পার্চ্চিত মর্ম্মর-মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় পরলোকগত আত্মার উন্নতিকামনায় উপাসনা পাঠ ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীইন্দিরা দেবী সময়োপযোগী কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১২ই পৌষ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় সময় ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্য-শ্রাদ্ধ তদীয় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভাস্করনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের শিবপুরের বাসবাটীতে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শয্যাসনাদি ষোড়শ দ্রব্য ও অন্ন-জল-বস্ত্র প্রভৃতি দানানন্তর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা পূর্ব্বক শ্রাদ্ধের উপযোগী উপদেশাদি প্রদান করেন। সভায় নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল; এবং সর্ব্বশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

জন্মদিবস—গত ১৭ই পৌষ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০॥০ ঘটিকায় শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস উপলক্ষে ক্ষিতীন্দ্র-ভবনে একটী পারিবারিক উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের উপাসনা, উপদেশ ও প্রার্থনান্তে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেবভাষায় আশীর্ব্বচন দ্বারা শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন।

নামকরণ—শ্রীঅমলেন্দু বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে গত ২৮শে পৌষ রবিবার সায়ংকালে তাঁহাদের শ্যামবাজারের বাসভবনে একটী পারিবারিক উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন এবং পুত্রের শুভেন্দু বিশ্বাস নাম দিয়াছেন। ভগবান নবকুমারকে কল্যাণে ও শ্রী-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত ও বিবর্দ্ধিত করুন।

শোকসংবাদ।

৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থ জামাতা যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২রা পৌষ মঙ্গলবার ব্রহ্মমুহূর্ত্তে পৃষ্ঠব্রণরোগে তাঁহার শিবপুরের বাসবাটীতে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ও রায়পুর চীফ্ কমিশনার কোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। কিন্তু কর্ণরোগে আক্রান্ত হওয়ায় অবশেষে উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; এবং প্রথমে আলবার্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও পরে হাবড়া জেলা স্কুলে প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। শেষে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইনি কখনই সাংসারিক বিপদে বা দুঃখ-কষ্টে মুহ্যমান হন নাই। পাঁচ বৎসর হইল ইনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইয়াছিলেন। ইঁহার শোকার্ত্ত পুত্রকন্যা ও পত্নী-পরিজনদিগকে এই গভীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

৺দেবকুমার রায় চৌধুরী—গত ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার বরিশাল লাখুটিয়ার জমিদার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ভবানীপুরের ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডস্থিত বাসভবনে অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। পত্নী ও জ্যেষ্ঠকন্যার বিয়োগ-শোকে বৎসর-দুই হইতে ইঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহারই ফলে হৃদ্‌রোগে ইঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পৌত্র ৺দ্বীপেন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবানের স্নেহাশ্রয় লাভ করিয়া ইঁহার শোকাহত আত্মা শান্তিলাভ করুক।

সংবাদ।

শ্রীমতী বাণী দেবীর উপাধি লাভ—গত ১৩ই পৌষ শনিবার মধ্যাহ্নে কলেজ স্কোয়ারের বৌদ্ধ-মন্দিরের সভাগৃহে 'নিখিল ভারত-বৌদ্ধ-সভা'র তত্ত্বাবধানে ডাক্তার নলিনাক্ষ দত্ত (M.A., B.L., P.R.S. Ph. D.) মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত-বৌদ্ধসাহিত্য-

সভা'র প্রাথমিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার কারণে এই সভা হইতে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীবাণী দেবীকে উক্ত দিবস সমাগত সভ্যবৃন্দের সানন্দ সম্মতিতে এবং সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে "সঙ্গীত-ভারতী (Doctor of Indian Music)" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। কল্যাণীয়া বাণী দেবীর এই যোগ্য সম্মানলাভে আমরা সানন্দে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাদিবস—প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাদিবস উপলক্ষে গত ৭ই পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণ উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ঘুরিয়া মহর্ষিভবনের পারিবারিক উপাসনামণ্ডপে (দালানে) সমাগত হইয়া সেখানে যথারীতি উপাসনা ও প্রার্থনান্তে সকলে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের ভবনে (৫।১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন) সমবেত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে আত্মজীবনী হইতে পাঠ, প্রসঙ্গ ও আলোচনায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করিয়া উভয়ত্রই 'মিষ্টিমুখের' ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ—উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গত ৯ই পৌষ সমগ্র দিনব্যাপী উৎসবের বৈকালিক উপাসনার ভার অর্পিত হইয়াছিল আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের উপর। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪৷৷৹ ঘটিকায় তিনি বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি উপদেশ ও উপাসনাদি করিয়াছিলেন। ভক্তিমতী মহিলারা কয়েকটি সঙ্গীত করিয়া সমবেত উপাসকগণের অন্তঃকরণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ।—গত ১৩ই ১৪ই ও ১৫ই পৌষ ধরিয়া দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীরামপুর-ব্রাহ্মসমাজের অষ্টষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৩ই পৌষ শনিবার সায়ংকাল ৭ ঘটিকায় ২০ নং বেনেপাড়া লেনে পুরাতন সমাজবাটীতে ভক্তিমান লাহিড়ীপরিবারের ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীমান পরেশ নাথ ও শ্রীমান সারনাথের আহ্বানে তাঁহাদের বিদ্যুদালোকিত ও সুসজ্জিত পুরাতন সমাজগৃহে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই পৌষ রবিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ৺তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রগণের আহ্বানে তাঁহাদের পুরাতন বাজারের বাসভবনে সমগ্র দিবসব্যাপী উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। উষা-কীর্ত্তনান্তর ৭৷৷৹ ঘটিকায় প্রাতরুপাসনা আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণে ভগবৎপ্রসঙ্গ এবং সায়ং ৬ ঘটিকায় সান্ধ্য উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৫ই পৌষ সোমবার অপরাহ্ণে ১নং বেনেপাড়া লেনে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের গৃহে বালকবালিকা-সম্মিলনান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই উপলক্ষ্যে আদি-ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ব্রাহ্ম-বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, সুকবি শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রভৃতি কলিকাতা হইতে তথায় গমন করিয়া উপদেশ, উপাসনা ও সঙ্গীতাদির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমনোরমা দেবী শ্রীপ্রভাত কুমারী দেবী প্রভৃতি ভক্তিমতী মহিলারাও ভাবময় সঙ্গীত দ্বারা সমবেত উপাসকগণের অন্তঃকরণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলন—গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই পৌষ ধরিয়া দিবসত্রয়ব্যাপী 'নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধসম্মিলনের' দ্বিতীয় অধিবেশন ৪এ, কলেজ-স্কোয়ারের সুসজ্জিত বৌদ্ধবিহারে মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থ এই ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়া যে সাধনাবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তথাগত হইয়াছিলেন, অধুনা জগৎ তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে না পারিলেও উহার আলোচনা আন্দোলন ও অভিনন্দনের দ্বারাও অশেষ কল্যাণ লাভ করিবে নিঃসন্দেহ। এই উদ্দেশ্যেই গত বৎসর হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা নগরীতে এই উৎসবের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে উপাসনা উপদেশ ও বক্তৃতাদির এবং পালি, সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গলা প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় আবৃত্তি, আলোচনা ও সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বুদ্ধদেবের মহত্নীর শিক্ষাপ্রচারের বিচিত্র আয়োজন হইয়াছিল।

মহাজন দিবস—গত ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬৷৷৹ ঘটিকায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মাগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য একটী সভা আহূত হইয়াছিল। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ এই সভায় "পুরুষ-তর্পণ" নামে একটী সুন্দর নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহা আগামী সংখ্যায় পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

———

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৮ | ১৮৫১ শক মাঘ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে। সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাঘোৎসবে উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে, জননীর আহ্বানে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। এই উৎসবের প্রারম্ভে হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত কর।

আমাদিগের সম্মুখে মাঘোৎসব উপস্থিত। যে মাঘোৎসবে দেবতারাও মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করেন; যে মাঘোৎসবে দেবমানব একহৃদয়ে পরব্রহ্মের জয়কীর্ত্তনে উদ্যত হয়েন, আমাদের সেই প্রিয়তম মাঘোৎসব সম্মুখে উপস্থিত। আমি জানি না যে, কি বলিয়া, কোন্ ভাষায়, সেই মাঘোৎসব উপলক্ষে সমাগত সাধুসজ্জন ও বন্ধুবান্ধবের হৃদয়মন উদ্বোধিত করিয়া তুলিব, অগ্নিময় করিয়া তুলিব; ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না যে, কি প্রকারে তাঁহাদের গভীরতম অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলিব; তাঁহাদের প্রাণে তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিব।

আমার নিজের শক্তি নাই বটে, কিন্তু যিনি অকিঞ্চনগুরু, তাঁহার সে শক্তি আছে। যাঁহার শাসনে অগণিত সূর্য্যচন্দ্র, অগণিত গ্রহতারকা সম্মুখের এই সীমাহীন দিশাহীন গগনপ্রাঙ্গণে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং নিত্যনিয়ত জীবন ও মৃত্যুর পথে পরিভ্রমণ করিতেছে; যাঁহার শাসনে অহোরাত্র-ঋতু-সম্বৎসর সকল যথানিয়মে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে, তাঁহার সে শক্তি আছে। সূর্য্যচন্দ্র যাঁহার চক্ষু হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রহরীস্বরূপে দণ্ডায়মান আছে, তাঁহার সে শক্তি আছে। অনাদি কাল এবং এই অনন্ত গগন যাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত, তাঁহার সে শক্তি আছে। যাঁহার আদেশে এই বিশ্বজগতে কতশত মহাজ্ঞানী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই অনন্তজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরম পুরুষের মহিমার ইঙ্গিতমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহার সে শক্তি আছে।

আজ সেই পরম গুরুর শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমি পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলকেই হৃদয়ের সহিত এই মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া পঙ্গুও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে, মূকও বাগ্মিতা লাভ করে, তাঁহারই শক্তিতে আমার শক্তি। আমি ক্ষুদ্র কীট হইলেও এই অনন্ত জগতের অধীশ্বর সেই অমৃত পুরুষের সন্তান,

সেই মহান্ অগ্নি হইতে নিঃসৃত একটী বিস্ফুলিঙ্গ। জগতের প্রত্যেক ধূলিকণা, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক মানবাত্মা তাঁহা হইতে নিঃসৃত এক একটা বিস্ফুলিঙ্গ। আজ তাই আমি সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিলাইয়া, বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর সহিত একপ্রাণ হইয়া, গিরিনদী, ভূধরসাগর, জীবজন্তু, দেবমানব, সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, এই মহোৎসবের মহান্ অবসরে সেই পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবনকে ধন্য কর। এই মহোৎসবের সময় দুঃখশোকের কথা, পাপতাপের কথা, নিরাশা-নিরানন্দের কথা, সংশয়-অবিশ্বাসের কথা, সকলই পশ্চাতে পড়িয়া থাক; যাহা কিছু মলিনতা, সমস্তই ছিন্ন কন্থার মত পরিত্যাগ কর। প্রসন্ন মুখে, বিমল হৃদয়ে, আনন্দের নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই আনন্দস্বরূপের উৎসবে উপস্থিত হও। আমাদিগের হৃদয় নবোৎসাহে নব আনন্দে নৃত্য করুক; আমরা এই মুহূর্ত্তেই নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হই।

আজ এই মহোৎসবের দিনে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের ভিতর দিয়াই তাঁহার করুণা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি। এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে তাঁহার করুণা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা বড়ই দেদীপ্যমান আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যে সময়ে ভারতবর্ষ সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার পেষণযন্ত্রের নিম্নে পড়িয়া শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হারাইতে বসিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়াই মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বীজ সর্ব্বপ্রথম নবতর ভাবে প্রোথিত করাইলেন। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের ফলে দেশের এবং জগতের যে কি মহান্ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজ মানবাত্মার স্বাধীনতারূপ যে বটবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, আজ সেই বৃক্ষ হইতে দেশে বিদেশে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে কত বিভিন্ন আকারে শিকড় নামিয়া সমুদয় পৃথিবীকে আপনার আশ্রয়ের ভিতর আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

দয়াময় পরমেশ্বরের এত দিকে এত রকমে মঙ্গলভাবের শুভ উদ্দেশ্যের পরিচয় যখন পাইতেছি, তখন তাঁহাকে করুণাময় বলিয়া ডাকিতে কুণ্ঠিত হইও না। যুদ্ধ, নরহত্যা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের কারণে তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিও না। সরিয়া থাকিবে কি? তাঁহার রাজ্য শুধু এই পৃথিবীটুকু নয়—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চরাচরই যে তাঁহার রাজ্য। তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া তো কোথাও যাইতে পারিব না। দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্যই বল, যুদ্ধ-মহামারীই বল, এসকলের প্রতীকারসাধনে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু ইহার কারণে যদি মৃত্যুও আসে, তাহাতেও বিমূঢ় হইলে চলিবে না। মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার চরণে আছড়াইয়া পড়, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর, দেখিবে যে, মৃত্যু তোমা হইতে দূরে পলায়ন করিবে। যাঁহার ভয়ে মৃত্যু আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় এবং যাঁহার ভয়ে মৃত্যু আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, সেই মৃত্যুঞ্জয় পরমেশ্বরকে অন্তরতম প্রাণসখা বলিয়া উপলব্ধি কর। যে ব্রহ্মাণ্ডপতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই আমার মত ক্ষুদ্র মানুষেরও সকল তাপ সকল ব্যথা স্বীয় কোমল হস্তে মুছাইয়া দেন। তাঁহার করুণার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ইচ্ছা হয় যে, আমার সকল কথা, সকল ভাষা, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হৌক, কেবল তাঁহাকে প্রাণনাথ হৃদয়েশ বলিয়া ডাকিবার ভাষা আমার জিহ্বাগ্রে জাগ্রত থাকুক। তিনি আমাদিগকে তাঁহার সূক্ষ্মতম কিন্তু অচ্ছেদ্যতম স্নেহপ্রেমের বর্ম্মে সর্ব্বদাই আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহোৎসবের সম্মুখে সেই প্রাণসখাকে সকলে মিলিতভাবে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার অবসর পরিত্যাগ করিও না। তোমাদের সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দাও—তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিও না। তাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিও না এবং বিভীষিকা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইও না। তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে যোগযুক্ত থাকিয়া সম্মুখের ব্রহ্মোৎসবকে সার্থক কর এবং জীবনমনকে পবিত্র ও সার্থক কর।

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতনী।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়)

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে মন্থনদণ্ড লইয়া দেশ-বিদেশীয় শাস্ত্ররাজি আলোড়ন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে উপনিষদপ্রতিপাদ্য সেই প্রাচীন একেশ্বরবাদ ভারতে আবার ফিরিয়া আসিল। যৌবনের প্রথম বিকাশের সঙ্গে প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপরে তাঁহার অনাস্থা জন্মিয়াছিল; কিন্তু এই অনাস্থা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিয়া নির্বীর্য্যভাবে তিনি অবস্থান করেন নাই। তিনি সত্যের ভিখারী, প্রকৃত সত্য লাভ করিবার জন্য তাঁহার দারুণ পিপাসা। সে সময়ে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি তাঁহার পিপাসা দূর করিতে পারেন। তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতেই হইবে, এই অধ্যবসায় লইয়া পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া তিনি দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোথায় পাট্না, কোথায় বারাণসী, কোথায় তিব্বত—তাঁহার অগম্য স্থান রহিল না। পাটনা সে সময়ে আরবী-ফার্সী ভাষার কেন্দ্র ছিল। তিনি তথায় গিয়া ঐ দুই ভাষা অভ্যাস করিয়া কোরাণের মর্ম্ম জানিতে চেষ্টা করিলেন। অসাধারণ মেধাশক্তি বলে সফলকাম হইয়া তিনি বারাণসী গমন করিলেন।

সে সময়ে বেদ ও উপনিষদচর্চ্চা বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপনিষদ চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। নিদারুণ পরিশ্রমের ফলে তিনি উহাতে এমন অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে, উত্তরকালে কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ তিনি বঙ্গভাষায় প্রকাশ করেন। প্রাচীন দর্শনের আলোচনাও বঙ্গদেশে একভাবে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; রাজা তাহাতেও সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে শারীরকসূত্র অনুবাদ সহ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বুঝিবার জন্য তিনি আপনার জীবনকে বিপন্ন করিয়া তিব্বত অঞ্চলে গমন করিলেন। সে সময়ে যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না, লৌহবর্ত্ম তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সত্য যাঁহার লভ্য ও কাম্য বস্তু, কে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে? আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে তিনি ভীরু বঙ্গবাসী, কলিকাতা হইতে বহুদূরে মফঃস্বলে তাঁহার আবাস-নিকেতন। কোথা হইতে তিনি এই অমানুষিক বীর্য্য লাভ করিলেন, কে তাঁহার সকল ভয় বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল, কে বা তাঁহার সুদূর পথশ্রান্ত দেহের সর্ব্ববিধ অবসাদ বিদূরিত করিয়া দিয়াছিল, আলোচনা করিতে গিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই! কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারি, দেশের মুক্তি-সাধনের জন্য যাঁহাদের জন্ম, দৈববলই তাঁহাদের একমাত্র সহায়, ভগবৎপ্রদত্ত অভেদ্য বর্ম্মই তাঁহাদিগকে সকল প্রকার বিপদপাত হইতে রক্ষা করে। তাঁহাদের পিপাসু অন্তরের ভিতরে প্রতিভার এমন এক অনন্ত আলোক অবতীর্ণ হয় যে, ভাষা ও শাস্ত্রের সর্ব্ববিধ জটিলতা ও কাঠিন্য তাঁহাদের নিকট পরাভূত হয়, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় তাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে, দশটি ভাষার উপর তিনি অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের যুগ হইতে প্রায় শত বৎসর অতীত হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে আজও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা সহজে বাইবেল ও কোরাণ পাঠ করিতে বিমুখ। কিন্তু রাজার হৃদয় এমনই বিরাট ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি এই উভয়বিধ গ্রন্থই পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া "তফতুল মাওয়াদিন" গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় এবং বাইবেল হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া Precepts of Jesus রচনা করিয়া যান। কোন অন্ধ সংস্কারের মোহ তাঁহাকে আপন কুক্ষিগত করিতে পারে নাই।

এক শত বৎসরের পূর্ব্ব সময়ের জন সমাজের চিত্র আপনার কল্পনার মধ্যে একবার আনয়ন কর। যে সময়ে জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে কালাপানি পার হইতে লোকে সাহস করিত না, সেই সময়ে রাজা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সে সময়কার বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রা তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। তিনি সেখানে গিয়া সুধীবর্গের নিকটে আপনার জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে যে সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। কি ধর্ম্মসংস্কারে, কি রাজনৈতিক ব্যাপারে, কি শাস্ত্রালোচনায়, কি স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে, তিনি যে আদর্শের সূচনা করিয়া গিয়াছেন ও যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং যে নব চেতনার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, একভাবে বলিতে গেলে সমগ্র ভারতের চিন্তার ধারা আজও সেই পথেই অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার জীবনের আর একটি বিশেষত্ব এই, তিনি দেশীয় ভাবকে পরিহার করেন নাই। কি ধর্ম্মপ্রচারে, কি খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে, কি বেশভূষায় তিনি জাতীয় ভাব আমরণকাল পোষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতেই বেদ-বেদান্ত উপনিষদ প্রাচীন দর্শন আবার এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অনেকের অন্তরে দেশীয় উপকরণ-বহুল প্রচলিত ধর্ম্মের উপরে অনাস্থা আইসে। কিন্তু রামমোহন রায়ের অন্তরে একেশ্বরবাদের যে সন্ধান জাগিয়াছিল, তাহা একভাবে বলিতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তখনও ইংরাজি-ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই, তিনি ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন পরিণত বয়সে। তিনি ঐ ভাষায় উপর সমধিক অধিকার লাভ করিয়া ইংরাজি-ভাষায় একেশ্বরপ্রতিপাদক পুস্তিকারচনা ও প্রকাশে আত্মনিয়োগ করিলেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিমাণও সামান্য নহে। পুস্তিকাদি রচনা ও প্রকাশে তিনি শিক্ষিতমণ্ডলীর অন্তরে ক্রমাগত আঘাত দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই। যখনই দেখিলেন যে কয়েকটি লোক ধর্ম্মসম্বন্ধে কতক পরিমাণে তাঁহার সমভাবাপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি ১৭৩৭ শকে "আত্মীয় সভা" স্থাপন করিলেন। সেখানে প্রকাশ্য ভাবে উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইতে আরম্ভ হইল। উহার তিনটি অধিবেশন প্রকাশ্য ভাবে বৃন্দাবন মিত্রের গৃহে, বড়বাজারে তুলাপটীতে কিশোরী লাল চোবের বাটীতে এবং ভূকৈলাস রাজবাটীতে হইয়াছিল। রাজা বৈষয়িক কার্য্যে বিব্রত হইয়া পড়ায় "আত্মীয় সভার" কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল। কিন্তু এই একেশ্বরবাদ রাজার অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় নীরবে বহিতেছিল। ক্রমে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন সমৃদ্ধিশালী কলিকাতার অধিবাসীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

তাঁহার অনুগত প্রধান শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার অপরাপর বন্ধু-বান্ধবের উত্তেজনায় তিনি বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহের সান্নিধ্যে ফিরিঙ্গি কমললোচন বসুর বাটীতে ভগবৎউপাসনা ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। "আত্মীয় সভায়" যে ভাব বিকশিত হইয়াছিল, কমল বসুর বাটীর উপাসনায় তদপেক্ষা আমরা অধিকতর ও পরিস্ফুটতর বিকাশ দেখিতে পাই। সেখানে আরও প্রকাশ্যভাবে একেশ্বরবাদ-প্রচারের আয়োজন, উহাকে স্থায়িত্বদানের অধিকতর আগ্রহ। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি সংস্কৃত কলেজের জনৈক উদারচেতা অধ্যাপক ছিলেন, তিনি রাজার দক্ষিণ হস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। ঐ স্থান হইতে বঙ্গ-ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হইল। প্রাথমিক ব্যাখ্যানগুলি রাজার রচিত এবং পরবর্ত্তী ব্যাখ্যানগুলি যাহার মধ্যে কয়েকটির সন্ধান মিলিয়াছে, তাহা বিদ্যাবাগীশের রচিত হইলেও বিদ্যাবাগীশ মৌখিক বক্তৃতার পরিবর্ত্তে উভয়বিধ ব্যাখ্যানের এক-একটি পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জনসাধারণের রোষ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অনেকে রাজার জীবন-নাশের জন্য উদ্যত; রাজা বিপদ বুঝিয়া তাঁহার মাণিকতলার উদ্যানবাটিকা হইতে উপাসনালয়ে আসিবার সময় পরিচ্ছদের অন্তরালে কিরিচ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে উপাসনার জন্য একটি স্থায়ী ও নিজস্ব গৃহ-সংগ্রহের আবশ্যকতা অনুভব হইতে লাগিল। এ বিষয়ে রাজা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহসম্পন্ন। তিনি ১৭৫১ শকে এই বর্ত্তমান গৃহ ক্রয় করিয়া ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে পবিত্র ১১ই মাঘ দিবসে তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই যে ত্রিতল দেখিতেছ, ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ কর্ত্তৃক বহু পরে নির্ম্মিত। শত বৎসর ধরিয়া অব্যাহতভাবে এখানে উপাসনা-কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের কোন বাধা ইহাকে আঘাত দিতে পারে নাই। রাজা উপাসনাপদ্ধতি নিজে রচনা করিয়া যান। উহাতে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত "ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ-কারণায়" এই মন্ত্র স্থান পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি বর্ত্তমান উপাসনাপদ্ধতি প্রচলন করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্মসমাজের জন্য Trust deed যাহা রচনা করিয়া যান, তাহা অপূর্ব্ব। উহাতে তাঁহার উদার হৃদয়ের ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। তিনি কোন সম্প্রদায়বিশেষের জন্য এই অট্টালিকা সংগ্রহ করেন নাই। সাম্প্রদায়িক ভাব তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করে নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন সকল সম্প্রদায়ের লোক বর্ণনির্ব্বিশেষে ও জাতিনির্ব্বিশেষে এখানে আসিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করে। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন। একেশ্বরবাদকে কেন্দ্র করিয়া সকলে মিলিত হউক, আপনাদের হৃদয়কে বিপুল ও বিরাট করিয়া তুলুক, একেশ্বরবাদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হউক, ইহাই তাঁহার প্রাণগত কামনা ছিল। তাঁহার রচিত Trust deedএ ইহাই সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে "Strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds."

তিনি ইচ্ছা করিয়া এই উপাসনালয়কে কোন নাম দেন নাই; নামহীন অবস্থায় বহুদিন ধরিয়া ইহার কার্য্যা-বলী চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমান রাজত্বের সময়ে যেমন গুরু নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি কয়েকজন অসাধারণ প্রকৃতির লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহারা বিরোধের পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু হিন্দুমুসল-

মানের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামুটি বিষয়ে মিলনের পক্ষপাতী এবং যাঁহারা হিন্দুমুসলমান উভয়েরই অপরিমেয় শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায় স্বীয় প্রতিভা বলে অজ্ঞাতসারে সেই পথেই চলিয়াছিলেন। রাজা স্বীয় জীবদ্দশায় সে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু একথা সত্য যে, যতই দিন যাইতেছে রাজার উপরে সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।

স্বতন্ত্র মতবাদ একটু পুরাতন হইয়া আসিলে তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ এবং তদনুযায়ী উপাসনাপদ্ধতি তাঁহার মৃত্যু অন্তে কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজ নাম ধারণ করিয়াছে, এবং প্রধানত ইহা তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখানে বলিতে চাই, স্বাধীন চিন্তার ধারাকে কেহ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের আদিগুরু। আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য যতই কেন হউক না, ব্রাহ্মসমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যতই বিভক্ত হউক না কেন, বিদ্বেষ ও বিসম্বাদ যেন আমাদের মধ্যে স্থান না পায়, আমরা যেন কাহাকেও বাক্যবাণে বিদ্ধ না করি। রাজার আদর্শ আমাদিগকে সর্ব্বসময়ে স্মরণে রাখিতে হইবে। মৈত্রীবন্ধনের জন্যই রাজার আগমন। ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠাই উহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিবস ধরিয়া আজ আমাদের শতবার্ষিক উৎসব। শতবর্ষ পূর্ব্বে এই মাঘেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ লইয়া আমরা যতই আলোচনা করিব, তিনি যে পথ আমাদের সম্মুখে প্রযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া আমরা যতই অগ্রসর হইব, ততই আমাদের জীবন ধন্য হইবে। সে পথ মৈত্রীর পথ, বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের অভিমুখীন হইবার প্রকৃষ্ট বর্ত্ম।

আজ এই শতবার্ষিক উৎসবের প্রারম্ভে জগৎজননীর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া যে সত্যধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া যাহা আরও প্রকটিত হইয়াছে, তাহা জীবনে বরণ করিবার সামর্থ্য ভগবান আমাদিগকে প্রেরণ করুন। তাঁহার রচিত বৈরাগ্যের সঙ্গীত আমাদের সাধনপথের সহায় হউক। "ভাব সেই একে" তাঁহার এই যে আদেশ ও উপদেশ, আমরা অন্য চিন্তা পরিহার করিয়া যেন প্রতিদিনের কতক অংশ ইহারই সাধনে নিযুক্ত থাকি। আমাদের বলবীর্য্য যেন দ্বিধা হইয়া না যায়। ব্রাহ্মসমাজ অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই অপ্রতিম ঈশ্বরকে আশ্রয় করিবার জন্য। এই পবিত্র ব্রত যেন আমরা জীবনে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই শতবার্ষিক উৎসবমুখে ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা।

উৎসবের প্রাণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আজ আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সমবেত হইয়াছি। তিনিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। এই উৎসবের প্রারম্ভে হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত কর।

প্রতি বৎসরই আমাদের প্রিয় মাঘ মাস আসে, আর চলিয়া যায়। প্রতি বৎসরই মাঘোৎসব আসে, আর মাঘোৎসব চলিয়া যায়। মাঘোৎসবের জন্য আমরা উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া থাকি; মাঘোৎসব উপস্থিত হইলে আমরা তাহাতে মাতিয়া যাই ; মাঘোৎসব শেষ হইয়া গেলে আবার আমরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এখন আমরা মাঘোৎসবের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি। এবারকার মাঘোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সাধারণ মাঘোৎসব নয়—এই মাঘোৎসবে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হওয়া অবধি শতবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। আজিকার এই উৎসবে বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানবীর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ধ্যানবীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে আমাদের অন্তর হইতে শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার সমুত্থিত হইতেছে।

এই উৎসবে জননীর আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রতিদিন তো আমরা প্রত্যেকে নীরবে ভগবানের সঙ্গে আত্মার যোগসাধনের জন্য নির্জ্জনে আত্মসমাধান করি। কিন্তু আজিকার এই উৎসব নির্জ্জনে আত্মসমাধান করিবার জন্য নয় ; আজ ভাইভগ্নী সকলের মিলিত ভাবে, একসঙ্গে, একহৃদয়ে জননীর চরণে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহারই জন্য আজ এই উৎসবের বিশেষ আয়োজন ; উৎসবের বংশী বাজিয়া উঠিয়া আমাদের প্রাণে নব জাগরণ আনিয়া দিয়াছে, তাই আজ উৎসবের মঙ্গল শংখ ধ্বনিত হইয়া আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। মোহনিদ্রায় ও আলস্যে কালহরণ করিবার এতটুকু অবসর আমাদের নাই।

অগ্রসর হইতে হইবে—শতাব্দী পরে আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার কথা উঠিতেই পারে না। অন্যোন্যসাহচর্য্যে ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ তাঁহার উপাসনা দ্বারা নিজেরও অগ্রসর হইতে হইবে এবং সকলকে লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রকার সকলের সহিত মিলিতভাবে উপাসনার পরিণামে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, সেই আনন্দই উৎসবের প্রাণ। ইহাই হইল ব্রাহ্মজীবনের এবং ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র।

সমাজেও থাকিতে হইবে, ধর্ম্মসাধনাও করিতে হইবে; সমাজে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে; সমাজের অপর পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়াই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে—এই ভাব, এই সত্যই ব্রাহ্মসমাজের আদ্যন্তমধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। আমাদের মাঘোৎসবই সেই ভাবের সেই সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

রোগ-শোক জরা-বার্দ্ধক্য, এ সমস্তই তো সংসারের নিত্য সহচর-অনুচর। সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব, সম্পদ ও বিপদের বিবাদ; পদে পদে সংসারের কঠিন আঘাত; কথায় কথায় উদ্যত অদৃষ্টবজ্রের বিভীষিকা; আত্মীয়স্বজনের হতাশার ক্রন্দনধ্বনি; ভাগ্যহীন অসহায় বন্ধুবান্ধবের তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস, এ সমস্তই তো সংসারের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ সমস্তই আমাদের প্রাণে ব্যথা দিতে অগ্রসর হয় সত্য; কিন্তু ভগবানের আশ্চর্য্য মঙ্গলবিধানে, সংসারের এই সমস্ত সহচর অনুচরদিগকে আমরা যতই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিব, যতই আমরা তাহাদের সহিত নির্ভীকহৃদয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিব, ততই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। কেবল তাহাই নহে। সংসারের সহিত সংগ্রামে যাহাতে আমরা বিজয় লাভ করিতে পারি; যাহাতে আমরা আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ করিবার অধিকার বজায় রাখিতে পারি, মঙ্গল-বিধাতা পরম পুরুষ পরমেশ্বর তাঁহার প্রকৃতিরাজ্যে তাহার উপায়সকলেরও বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতির চারিদিকে চক্ষু খুলিয়া দেখ, সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র আকর ভগবান সর্ব্বত্র কি অনুপম সৌন্দর্য্যরাশিই না ঢালিয়া রাখিয়াছেন, আনন্দের কি অক্ষয় রসধারায় না তিনি বিশ্ব-জগতকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। শারদ-প্রভাতের বিগলিত স্বর্ণধারা, বিহগদিগের সুললিত কাকলি, বিচিত্র সুগন্ধ কুসুমরাশি, পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না, এ সমস্তই আমাদের সম্মুখে আনন্দের প্রস্রবণ দিবানিশি উন্মুক্ত রাখিয়াছে। এই সকলের ভিতর দিয়া ঈশ্বরই স্বয়ং আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই উৎসবের ভিতর দিয়াও তিনিই তাঁহার আনন্দ-মঙ্গল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতের ঋষিরা সকল স্থানে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থার ভিতরে ভগবানের আনন্দরূপে প্রকাশ দেখিয়া আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই আনন্দরূপ ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহাকে রসস্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। এই "রস-স্বরূপ" কথাটীতে ঋষিদের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত প্রেম, হৃদয়ের যাহা কিছু ভাল ভাব, সমস্ত যেন ঘন হইয়া, একত্র মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ... আনন্দস্বরূপের আনন্দসাগরে অবগাহন করা মানবের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার হইতে আমাদিগকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা নিজেদের দোষেই এই অধিকারকে ব্যর্থ করিয়া তুলি। উচ্চনীচের ভেদা-ভিমানে আপনাকে বড় দেখিয়া অপরকে হেয়দৃষ্টিতে দেখিবার স্পর্দ্ধা কর; লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অপরের প্রতি হিংসাপ্রদর্শনে অগ্রসর হও, আনন্দ-সাগর কলুষিত হইয়া উঠিবে, সুনির্ম্মল আনন্দসাগর ভেদ করিয়াও তোমার সম্মুখে পঙ্করাশি উত্থিত হইবে। আপাতসুখের আশায় তুমি অনাচার-কদাচারের আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার শরীর মন ও আত্মার আনন্দ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইবে। তুমি সত্যের পথ ছাড়িয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার রাষ্ট্রনীতিই বল, সমাজনীতিই বল, অথবা যে নীতিই বল না কেন, সমস্তই কলুষিত হইয়া উঠিবে; জীবনের সকল বিভাগে, সমাজের সর্ব্ব অঙ্গে শতবিধ কুসংস্কার প্রভৃতির আগাছা উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে মৃত্যুর মুখে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিবে—আনন্দের মূল শুকাইয়া যাইবে—উৎসবের প্রাণ অন্তর্হিত হইবে।

প্রত্যক্ষ কর, এই উৎসবযজ্ঞে আনন্দস্বরূপ ভগবান তাঁহার মঙ্গলচক্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছেন। কে সেই চক্র-গ্রহণে অগ্রসর হইবেন? ভগবানের সত্য আশ্বাসের মঙ্গল-বাণী এই উৎসব-যজ্ঞকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কে সেই মঙ্গলবাণী অন্তরে ধারণ করিতে অগ্রসর হইবেন? হৃদয়কে মলিনতার পঙ্কমুক্ত করিয়া সেই চক্র-গ্রহণের অধি-কারী না করিলে; অন্তরকে মঙ্গলভাবে, মঙ্গল ইচ্ছায়, সত্য আচারব্যবহারে বিশুদ্ধ করিয়া সেই মঙ্গলবাণী শ্রবণের অধিকারী না করিলে, বৃথা এই উৎসব, বৃথা আমাদের আনন্দ-কোলাহল এবং বৃথা আমাদের আনন্দ-সঙ্গীত। আমাদের এই উৎসবে, আমাদের এই পরস্পরমিলনে যদি আমরা নব-প্রাণের নবতর প্রেরণা লাভ না করি, অন্তরে যদি পরস্পরের সহযোগে মিলনসম্ভোগের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা অনুভব না করি, তবে বন্ধ করিয়া দাও এই বৃথা উৎসব, কাজ নেই এই মুখোসপরা আনন্দের কপট কোলাহল-কলরবে। শতাব্দী পরেও যদি আমরা অন্তরে সত্যকার উৎসবের আনন্দ না আনিতে পারি, মুখে না দেখাইলেও অন্তরে যদি পরস্পরের প্রতি অপ্রেম, অসদ্ভাব পোষণ করি, তবে শতাব্দী ধরিয়া করিলাম কি—তবে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়, জন-সমাজের নিকট আমাদের মুখ দেখাইব কি প্রকারে?

কিন্তু ভগবান আমার অন্তরে যে অভয়বাণী অহর্নিশি শুনাইতেছেন, সেই অভয়বাণীর বলে আমি জগতবাসীকে শুনাইতে চাই—ভয় নাই—ভয় নাই—তাঁহার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াও, তাঁহার অজেয় পতাকা উন্মোচিত করিয়া তাহার তলে নির্ভয়ে আসিয়া দাঁড়াও—সকল ভয়, সকল শঙ্কা বিদূরিত হইবে। আপনাকে জান যে, তুমি আনন্দস্বরূপের সন্তান, তুমি অমৃতপুরুষের সন্তান—নিরাশা নিরানন্দ, দুঃখশোকের বিভীষিকা তোমার অন্তরে আসিবার অধিকার নাই! বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ব্বে এমন সুখের কথা, প্রাণের এমন শান্তিপ্রদ বার্ত্তা আর কোনও ধর্ম্মই এত স্পষ্ট ভাষায় বলিতে সাহস করেন নাই। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই ব্যক্তিবিশেষের নয়, জাতিবিশেষের নয়, দেশবিশেষের নয়, কিন্তু প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভগবানের সহিত সম-ধর্ম্মিত্ব সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছেন; তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রচারক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজের এত গৌরব, এবং সেই ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিবার জন্য আমাদের সকলেরই এত আগ্রহ।

প্রত্যেক মানবই অমৃতের পুত্র; এবং এই সত্যই মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটনের অনন্য উপায়, ইহা জানিয়া শতবিধ দুঃখদৈন্যের বিভীষিকা দূর করিয়া দাও, শঙ্কাত্রাস পদদলিত করিয়া দাও। মিথ্যা মায়ার কথায়, মিথ্যা ছলনার বাণীতে ভগবানকে ভুলিয়া মৃত্যুমোহের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে প্রবেশ করাইও না। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় বিরাট পুরুষকে প্রত্যক্ষ কর; মানবের অন্তরে যে চৈতন্যময় ভূমা পুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর।

ব্রাহ্মসমাজ যেদিন অমৃতের পুত্র হইবার কারণে, ভগবানের সহিত সমধর্ম্মিত্বের কারণে, দেশ, জাতি ও কালনির্ব্বিশেষে প্রতি মানবের ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার বিঘোষিত করিলেন, সেদিন দেশে কি আশ্চর্য্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সেইদিন মাঘোৎসবের শুভ ১১ই মাঘে, ঐ সত্যেরই সুফলপ্রসূ বারিধারা লাভ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বীজ মহাসমারোহে প্রোথিত হইয়াছিল। তাই সেইদিন শুধু কয়েক-জন ব্রহ্মোপাসকের নহে, কিন্তু সমগ্র দেশের এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর মহামহোৎসবের দিন। সেইদিন অবধি কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; কত মহাত্মা গগন কম্পিত করিয়া এই উৎসবের গান গাহিয়াছেন। আজ শতাব্দী পরে এই উৎ-সবের প্রারম্ভে তাঁহাদের হৃদয়ের উপলব্ধি, তাঁহা-দের নবপ্রেরণা আমাদিগকেও অমৃতধারায় অভি-ষিক্ত করিতেছে; আমাদেরও অন্তরে নবচেতনা ও নবশক্তি আনিয়া দিতেছে। এই নবশক্তির অনুভূতিই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, আমাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই; অশুভ অমঙ্গল বিপদ আপদ আমরা যতদূর দুর্ব্বহ ভার বলিয়া মনে করি, উহারা তত দুর্ব্বহ নহে—ঐ সকল ভেদ করিয়া মঙ্গলের চির উৎস হইতে শত নির্ঝর নামিয়া জগতসংসার সিক্ত রাখিয়াছে। এই নব-শক্তির অনুভূতিই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, অজ্ঞানের অন্ধকার চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না, পাপের অন্ধকার আমাদিগকে চিরকাল গ্রাস করিয়া রাখিতে পারে না; আমাদের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রভাবে, জ্ঞানের তেজে সে অন্ধকার অচিরেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে!

আজ এই উৎসবের প্রারম্ভে আমাদের অন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার সত্য প্রতিষ্ঠিত হউক; আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে উৎসবের প্রাণ আনন্দ সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। জীবনের প্রতিদিবসের দুঃখদৈন্যের গ্লানি পথের ধারে সঞ্চিত থাক। আমাদের মোহগ্রস্ত জীবনের অবসাদ আজ পশ্চাতে পড়িয়া থাক; আমাদের ভুলভ্রান্তি সমস্তই ধরণীর ধূলির সাথে মিশিয়া যাক। আজ এই উৎসবের মাঝে আমাদের সমস্ত মর্ম্মব্যথা তুচ্ছ হউক।

হে অন্তর্যামী! আজ তুমি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বিরাজমান হও। তুমি যে পুত্র-কলত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতে প্রিয়তম; তুমি যে আমাদের উৎসবের প্রাণ, আনন্দের মূল উৎস, এই সত্য আজ আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করিতে দাও। আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে, প্রত্যেকের শিরায় শিরায়, আমাদের প্রত্যেকের চৈতন্যে তোমার আগমনে আনন্দস্রোত উদ্বেলিত হইয়া উঠুক। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, হে হৃদয়নাথ, জলদগম্ভীর মন্দ্রে একবার তোমার নব উৎসাহের বাণী শোনাও। তোমার অমৃতধারায় আমাদের প্রাণের জীর্ণতা, শুষ্কতা বিদূরিত হোক। আমরা জানি, পতনঅভ্যুদয়, হর্ষবিষাদ, সম্পদ-বিপদের ভিতর দিয়াই তোমার চরণতলে আমাদের উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা জানি যে, কখনও বা সুখসম্পদের কিরণজাল আমাদের গমনপথ আলোকিত করিয়া তুলিবে; কখনও বা উহা দুঃখ-বিপদের গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইবে, ঝঞ্ঝা-ঝটিকা আমাদিগকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিবে। সেই দুর্দ্দিনে, হে মৃত্যুর অতীত পরম পুরুষ, হে অভয়দাতা মঙ্গলবিধাতা, তুমি আমাদের প্রাণে অভয়বাণী শুনাইয়া বলবিধান করিও। আমাদিগকে

এই বর দাও আমরা যেন একনিষ্ঠভাবে তোমারই পথে চলিতে পারি। মানবাত্মাতে তুমি যে আনন্দমূর্ত্তিতে স্বপ্রকাশ আছ, তাহাই আমাদের অন্তরে ফুটাইয়া তোল। তুমি ভূমা, তুমিই রসস্বরূপ। এসো প্রভু—আমাদের সুমার্জ্জিত ও সুসজ্জিত হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া তোমার দিব্যমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হও। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বসকল অপহৃত হৌক, সকল বিরোধ শান্ত হৌক। তোমার উপস্থিতিতে আমাদের পাপতাপ লজ্জাভয় বিনাশপ্রাপ্ত হৌক; কাপুরুষ ভীরুর ভীতিসঙ্কুচিত জড়ত্ব বিদূরিত হৌক। বিগতবিবাদং তোমার আবির্ভাবে আমাদের শত্রু যাহারা তাহারাও বন্ধুরূপে দেখা দিক এবং আমাদের সমবেত কণ্ঠ হইতে তোমারই জয়ঘোষণার বিপুল আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইয়া গগনের পরতে পরতে প্রতিধ্বনিত হৌক। তোমার নামে আমরা যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই মহোৎসব সার্থক হৌক।*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতাপ্রীতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মুখবন্ধ।

আজ মহর্ষির তিরোভাবের দিন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে যে সকল স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল স্মৃতিসভার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, সভাস্থলে উপস্থিত বক্তা ও শ্রোতা সকলে পরস্পর আলোচনা করিয়া শিখিতে চান যে, সেই সকল মহাপুরুষদিগের জীবনের ভিতর কি শিক্ষা করা যায়; কোন্ বস্তু ধরিয়া, কিসের প্রভাবে সেই সকল মহাপুরুষেরা মহাপুরুষের আসন অধিকার করিয়াছেন; কোন্ পদার্থের দ্বারা তাঁহারা নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন যে তাঁহারা towering personality লাভ করিলেন, আর তুমি আমি তাহা লাভ করিতে পারি নাই। আমি উহাই শিক্ষা করিবার জন্য—আজ এই পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিবার জন্য আমার বিশেষ অধিকার আছে মনে করি, কারণ তিনি আমার পিতামহ এবং সেই কারণে তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিবার জন্য আপনাদের সদয় অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি।

উন্নতি বহুমুখী।

জলাশয় হইতে জল উঠাইতে গেলে শুধু এক ঘটি জলই ওঠে না, কিন্তু তাহার সঙ্গে জলাশয়ের আরও কতকটা জল অনেকদূর উঠিয়া পড়ে। সেইরূপ মহাপুরুষও যখন বিশেষভাবে কোন এক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার উন্নতি সেই এক বিষয়েই আবদ্ধ থাকে না, অন্যান্য বিষয়েও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই অল্পবিস্তর উন্নতি লাভ করেন। যিনি প্রজ্ঞানের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, বিজ্ঞানের পথেও তাঁহার কতকদূর অগ্রসর না হইয়া উপায় নাই; আবার বিজ্ঞানেরও পথে যিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, প্রজ্ঞানেরও পথে তাঁহার কতকদূর অগ্রসর হইতেই হইবে—না হইয়া উপায় নাই। রাজা রামমোহন রায় যখন অধ্যাত্মরাজ্যের উন্নতিশিখরে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি সেই একই বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উন্নতিসাধনের পথে অগ্রসর হইতে স্বতই বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি যে হিন্দুসমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ সেই হিন্দুসমাজকেও উন্নতির পথে তুলিয়া ধরা তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। সেইরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যখন ভারতের বহু সহস্র যুগব্যাপী ধারা অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্ম বিষয়ে উন্নতি লাভ করিলেন, তাঁহার সেই উন্নতির সঙ্গে দেশে নানাবিষয়ক উন্নতির একটা বাতাস বহিয়া গিয়াছিল; রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাই প্রকৃতির নিয়মেই তাঁহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ হিন্দুসমাজেরও উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের অবস্থা সমুন্নত ছিল না, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, ঐ যে বলপূর্ব্বক সতীদাহের অন্যায্যতা জনসাধারণের উপলব্ধিতে আসে নাই, তাহাই তো তদানীন্তন হিন্দুসমাজের অধঃপতন ও শোচনীয় অবস্থা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই সতীদাহ নিবারিত হইয়াছিল বটে, এবং হিন্দুসমাজে উন্নতির অরুণ আভা দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ের হিন্দুসমাজ রামমোহন রায়ের সময় হইতে বড় অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে অযথা গুরুবাদ, অযথা পৌরোহিত্য প্রভৃতির সাহায্যে প্রবর্ত্তিত সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার যে পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার দেশের গগনাঙ্গনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে সেই অন্ধকারের এক চতুর্থাংশও অপসৃত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। যে পথ দিয়া দেশবাসীকে সত্যের লক্ষ্যভূমিতে উপনীত হইতে হইবে; ভগবৎপ্রাপ্তির যে পথ ভারতের পূর্ব্বতন ঋষিরা ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, কালক্রমে সেই পথ শতবিধ আগাছায় কণ্টকাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল—সেই পথ দিয়া লক্ষ্যভূমিতে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে সাহসের অভাবে, আলস্যজনিত অবসাদের কারণে রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে সে সমস্ত আগাছা কাটিয়া কুটিয়া পথটী জনসাধারণের জন্য খুলিয়া দিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। একমাত্র অসমসাহসিক রাজা রামমোহন রায়ই স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির

* শততম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই মাঘে বিবৃত।

অসির সাহায্যে, অসাধারণ জ্ঞানের কুঠারের আঘাতে সেই সকল কণ্টকতৃণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া পথটী জনসাধারণের গমনাগমনের উপযোগী করিয়া খুলিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি সেই পথটাকে সুপ্রশস্ত সুপরিষ্কৃত রাজপথে পরিণত করিবার অবসর পান নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্যতর যুগপ্রবর্ত্তক।

অবশেষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই স্বয়ং এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, বেদান্তপ্রবেশ-প্রণেতা চন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতির ন্যায় সুপণ্ডিত পণ্ডিতদিগের সাহায্যে ঋগ্বেদ অবধি তন্ত্র পর্য্যন্ত ভারতের শাস্ত্রসিন্ধু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া ঐ পথটাকে সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিণত করিয়া শুধু ভারতবাসী নহে, কিন্তু জগতবাসী জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির মুখ খুলিয়া দিবার জন্য যেমন বর্ত্তমান যুগ রামমোহন রায়ের যুগ বলিয়া সর্ব্বসাধারণ্যে স্বীকৃত হয়, এবং রাজা রামমোহন রায়ই যেমন সাধারণত যুগপ্রবর্ত্তক ও নমস্য মহাপুরুষ বলিয়া গৃহীত হন, সেইরূপ আর একদিক দিয়া বর্ত্তমান যুগকে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথেরও যুগ বলিতে পারি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও বর্ত্তমান যুগের অন্যতর যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া ধরিতে পারি। রাজা রামমোহন ;রায় উন্নতির যে সকল ক্ষীণধারা স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই সকল ধারা মর্ত্ত্যভূমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সুপ্রশস্ত নদের আকারে বহমান হইবার সুযোগ দিয়া বর্ত্তমান যুগের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বাণী।

শুধু বেদবেদান্ত প্রভৃতি ভারতের শাস্ত্রসিন্ধু নহে, কিন্তু তৎসঙ্গে বাইবেল, কোরাণ এবং পাশ্চাত্যজগতের দর্শনাদি আলোচনা-অনুধ্যানের ফলে ও সুতীক্ষ্ণ মনীষার বলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতার এই এক অসাধারণ মন্ত্র আবিষ্কার করিলেন যে, ব্রাহ্মণ-পঞ্চম জাতিনির্ব্বিশেষে, ইংলণ্ড-ভারত দেশ-নির্ব্বিশেষে, ধনী-দরিদ্র ও পণ্ডিত-মূর্খ অবস্থানির্ব্বিশেষে, মানবমাত্রেরই ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার আছে। এই উদারতম বাণী, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার এই চরম বাণী রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জীবনের কার্য্যের দ্বারা অতি ক্ষীণ স্বরে আমাদিগকে শুনাইলেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই জগতের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম স্পষ্টতম ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার পূর্ব্বে এই গভীরতম সত্য আর কেহই এত স্পষ্টরূপে এত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, রাজা রাম-মোহন রায়ের আবির্ভাব না হইলে, খুব সম্ভব, আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে পাইতাম না। ইহাও কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হইলে আজ আমরা রাজা রামমোহন রায়কে চিনিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের মূল কেন্দ্র ছিল, সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল। এই স্বাধীনতার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই তিনি পূর্ব্বতন প্রথার অনুগমনে হ্রীং ক্লীং প্রভৃতির ন্যায় গুপ্তমন্ত্রের দ্বারা দীক্ষার্থীকে দীক্ষিত করিবার ব্যবস্থাপ্রবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনমূলক ও মঙ্গলসাধক উপাসনার অমোঘ মন্ত্র মানবমাত্রেরই জন্য চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিলেন,—ছড়াইয়া দিলেন। স্বাধী-নতা তাঁহার প্রাণ ছিল বলিয়াই তিনি ইহাকে কর্ণেজপ গুরুমন্ত্রের ন্যায় গুরুর অন্তর-কৌটায় আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইতে পারিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের জীবনের আর সমস্ত ঘটনার কথা যদি মুছিয়া যায়, তাঁহার প্রকৃত উপাসনার বীজমন্ত্র এবং স্বাধীনতার বাণী চিরজাগ্রত থাকিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

দেবেন্দ্রনাথ সকল ধর্ম্মে সমদৃষ্টি।

এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইবার কারণেই তিনি সকল ধর্ম্মের প্রতি সমদৃষ্টি হইতে পারিয়া-ছিলেন। হাফেজের কবিতা শুনাইতে শুনাইতে তিনি কিরূপ মসগুল হইয়া যাইতেন, তাহা ব্রাহ্মমণ্ডলীর অনেক প্রাচীন ব্যক্তির নিকট অনেক ভাবে শোনা যাইত। মহর্ষি খৃষ্টধর্ম্মেরও প্রতি বীতরাগ ছিলেন না। আমার বেশ মনে পড়ে, একদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে গিয়াছি—দেখি, তাঁহার সম্মুখে এক-খানি ছোট তেপায়ার উপর একখানি কাল চামড়ায় বাঁধা বাইবেল রাখা আছে। যতদূর মনে পড়ে, তাহা হইতে এক অংশ তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। আমি তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমি খুবই জোরের সহিত বলিতে পারি যে, তিনি কোনও ধর্ম্মেরই বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও কোনও ধর্ম্মের অন্তর্গত নরপূজা, মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ প্রভৃতির সমর্থক অংশ খুব সাবধানতার সহিত দূরে পরিহার করিতেন। আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনায়, নরপূজা মূর্ত্তিপূজা অবতারবাদ প্রভৃতি খুব সহজেই আমাদের দেশে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা তিনি বিবেচনা করিতেন, এবং এবিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা ও ভীতি ছিল, ইহা আমরা বেশ জানি। এবিষয়ে তিনি কি হিন্দুধর্ম্ম, কি মুসলমানধর্ম্ম, কি খৃষ্টধর্ম্ম, কোনও ধর্ম্মেরই মধ্যে ভেদবিচার করিতেন না। দুই একটী গল্প বলিলেই এবিষয়ে তাঁহার মনোভাব পরিস্ফুট হইবে আশা করি। আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে রাজা রামমোহন রায়ের যে স্মৃতিসভা সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্মৃতিসভায় রামমোহন রায়ের একটা প্রস্তর-মূর্ত্তি রাখা হয়, এবং সেই প্রস্তরমূর্ত্তির কণ্ঠে রাশি রাশি পুষ্পমাল্য অর্পিত হইয়াছিল; তদুপরি, রাজার পরমভক্ত ও জীবনীলেখক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রতি, কথায় কথায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে করিতে তাঁহাকে অনেকটা দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মহর্ষি সভার বিবরণ স্বকর্ণে শুনিয়া ভবিষ্যতের স্মৃতিসভায় রাজার কোন প্রকার প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন, এবং তদনুসারে আমাদের বাটীতে পুনরায় যে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সে সভায় রাজার কোনও প্রকার মূর্ত্তি চিত্র বা প্রস্তরমূর্ত্তি রাখা হয় নাই। একবার মহর্ষির অন্যতর পৌত্র ৺দ্বিপেন্দ্রনাথ এবং মহর্ষির

শিষ্য ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী পরামর্শ করিয়াছিলেন যে মহর্ষির পরলোকগমনের পর তাঁহার দগ্ধাবশেষ ভস্ম লইয়া শান্তিনিকেতনের সুপ্রসিদ্ধ ছাতিমতলায় প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটী মন্দির নির্ম্মিত করাইবেন। কোনক্রমে কথাটী মহর্ষির কানে গিয়া পৌঁছাইল। তিনি উভয়কে ডাকাইয়া ঐ অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে ঐরূপ কার্য্যের ফলে তাঁহার সমস্ত জীবনের সংকল্প ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সাধারণত এই দুইটী কথা ক্ষুদ্র মনে হইলেও আমাদের দেশবাসীর যেপ্রকার মানসিক ভাব, তাহাতে মহর্ষির এপ্রকার মত পোষণ করা অস্বাভাবিক হয় নাই। আমাদের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মহর্ষির নিজের একটী মূর্ত্তি রাখা আছে; আশ্চর্য্য! কয়েকজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সেই মূর্ত্তিকে দেবমূর্ত্তি বিবেচনায় প্রতিদিন নিয়মিত ফুলচন্দনে পূজা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টবিরোধী ছিলেন না।

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপরে দণ্ডায়মান হইবার কারণেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ত্রিত্ববাদী প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম এবং তাঁহার সমসাময়িক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রচার-প্রণালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসলেখকদিগের অনেকেই মহর্ষির সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহাদের সময়ে যে কলহ-বিবাদ ব্রাহ্মসমাজে সমুত্থিত হইয়া মহর্ষি-ব্রহ্মানন্দের বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছিল, সেই কলহবিবাদের কোন বিষয়েরই বিচার এখানে করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু ইহা বলিলে নিশ্চয়ই অসংগত হইবে না যে, সেই কলহ-বিবাদের কারণে তাঁহাদের কতকটা দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের লিখিত ইতিহাসেও উহার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ একটী ইতিহাসে লিখিত আছে—(দেবেন্দ্রবাবুর) "খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিষম বিদ্বেষ এবং আন্তরিক ঘৃণাই চিরদিন প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল হিন্দু ধর্ম্মকেই তিনি সর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন"। উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতার বলে আমি যাহা জানি তাহাতে খুব জোরের সহিত বলিতে পারি যে, ঐ উক্তি ভ্রমপূর্ণ ও অনিষ্টকর উক্তি। রাজা রামমোহন রায় কল্পিত চীনদেশীয় লোকের মুখে উপহাসপূর্ণ বিচারের ভিতর দিয়া খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাহাতে রাজাকে যদি খৃষ্টবিরোধী বলা না যায়, তবে প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম্ম এবং তাহার অন্যায় প্রচারপ্রণালীর বিরুদ্ধে যাওয়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও খৃষ্টবিরোধী বলা যাইতে পারে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টবিরোধী, এই অযথা অপবাদ আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সময় আসিয়াছে, যখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের ঐ সকল কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে, হৃদয় হইতে ঐরূপ অপবাদ অসংগত ও ভিত্তিহীন বলিয়া নির্ম্মূলরূপে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে যত্নবান হইতে হইবে।

অন্যায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারপ্রণালীর বিরোধী ছিলেন।

মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি কখনও কিছু বলিয়াছেন বলিয়া তো মনে পড়ে না—বলিবার কোনও অবসরই আসিয়াছিল বলিয়া জানি না। একথা অস্বীকার করি না যে, নরপূজা অবতারপূজা প্রভৃতির প্রতীকরূপে খৃষ্টপূজার এবং বিশেষভাবে তাহার নীতিবিরুদ্ধ প্রচার-প্রণালীর বিরুদ্ধে তিনি যথাশক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার কারণ দেবেন্দ্রনাথের গভীর স্বাধীনতাপ্রীতি। সেই সময়ে একদিকে আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে খৃষ্টান মিশনরিগণ চাঁদাসংগ্রহের উদ্দেশ্যে হিন্দুসমাজের বড় বেশী কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অপরদিকে ছলে বলে কৌশলে এদেশবাসীকে খৃষ্টান করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সকল ঘটনা দেবেন্দ্রনাথকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিল। ঐ যে মতের স্বাধীনতা প্রকারান্তরে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল, উহা দেবেন্দ্রনাথের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাই তিনি বিশেষভাবে খৃষ্টধর্ম্মের তাদনীন্তন প্রচারপ্রণালীর বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। উহারই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকল্পে তিনি হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন—যাহার প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়। উহারই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকল্পে তিনি তাঁহার পরম বন্ধু ও সহায় ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু দ্বারা সেই সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক অগ্নিময় বক্তৃতা দেওয়াইয়া তদানীন্তন মিশনরিগণের ভিতরে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল উপায় অবলম্বিত না হইলে আজ এদেশ হইতে Hindu culture যে কতদূরে সরিয়া যাইত তাহা বলা যায় না।

বাঙ্গলায় পত্রব্যবহার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে স্বাধীনতাপ্রিয়তা এতই গভীর ছিল যে, তিনি official চিঠি না হইলে ইংরাজী ভাষায় চিঠি লিখিতেন না। সেই কারণে আমাদের পরিবারে সাধারণত বাংলায় পত্রব্যবহার একটা গৌরবের প্রথারূপে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা যখন দেখিতাম যে, কোন পরিবারে পিতাপুত্র নিজেদের মধ্যে ইংরাজীতে পত্রব্যবহার করিতেছেন, তখন আমরা তাহা অবাক্-দৃষ্টিতে দেখিতাম এবং হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতাম।

উপাধিলাভে বিমুখতা।

স্বাধীনতাপ্রিয়তার ফলেই তিনি কোনপ্রকার রাজোপাধি লাভের জন্যও লালায়িত হন নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্য নহে। যে শাণ্ডিল্য-গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে সমাগত সেই শাণ্ডিল্যগোত্রীয়দিগের আদিপুরুষ মহাপুরুষ কবি ভট্টনারায়ণ রাজা আদিশূরের নিকট হইতে ভূমি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহা রাজপ্রসাদরূপে বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই। প্রবাদ আছে যে, ইহাঁর পিতা পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়কে রাজোপাধি দিবার প্রস্তাব হইলে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে "বাবু" উপাধিই যথেষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুপ্রবণতার কারণ।

স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকিবার কারণেই তিনি উপনিষৎ প্রভৃতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনের ভাব ছিল এই যে, নিজের দেশে নিজেদের শাস্ত্রে যখন শতসহস্র যুগের

সঞ্চিত অমূল্য ধন পাওয়া যায়, সামান্য চেষ্টায় যখন সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তখন দূরদূরান্তরে পাশ্চাত্য-সেবিত শাস্ত্রাদির ভিতরে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আকুলচিত্তে ধাবমান হইবার প্রয়োজন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি প্রবণতার, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থকে শ্রুতিস্মৃতির মন্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবার ইহাই একমাত্র কারণ।

উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী।

স্বাধীনতা তাঁহার পরম প্রিয় বস্তু হইলেও উচ্ছৃঙ্খলতার তিনি এতটুকু পক্ষপাতী ছিলেন না। বরঞ্চ আমার মনে হয় যে, তিনি শৃঙ্খলার একটু বেশী ভক্ত ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় অথবা পারিবারিক কোন অনুষ্ঠানের সময় বেদীর কোন্ দিকে কে বসিবেন, কে উপাসনাকার্য্য করিবেন, কে বা প্রার্থনা করিবেন, কে বা উপদেশ দিবেন, এ সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া তাহা ছাপাইয়া এক-একখানি মুদ্রিত কাগজ প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে দেওয়াইতেন।

উপসংহার।

এই স্মৃতিসভা যাঁহার উদ্দেশে আহূত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গেলে আমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিয়া সত্যং শিবং সুন্দরং পরমেশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে; উচ্ছৃঙ্খল ভাবকে হৃদয় হইতে নির্ম্মূল করিতে হইবে। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের আসন অধিকার করিতে গেলে একদিকে যেমন সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাকে, বিশেষত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে প্রাণের বস্তু করিয়া লইতে হইবে; অপরদিকে তাঁহার সেই অমোঘ মুক্তিমন্ত্র—ভগবানে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনরূপ একমাত্র উপাসনা দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়—সেই অমোঘ মুক্তিমন্ত্রকে কৌস্তভ মণির মত অন্তরে ধারণ করিতে হইবে, এবং সেই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে।*

মিলনোৎসবে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আজ আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সমবেত হইয়াছি। তিনিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। এই উৎসবের প্রারম্ভে হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত করি।

এই মাঘ মাসের শুভ একাদশ দিবসে ব্রাহ্মসমাজের এক শতাব্দী পূর্ণ হইতে চলিল। সেই উপলক্ষ্যে আজ যে আমরা সকল ব্রহ্মোপাসক ছোটখাটো মতামতের পার্থক্য ও বিভিন্নতা ভুলিয়া গিয়া একত্র মিলিত হইয়া যথার্থই একপ্রাণে একহৃদয়ে সমবেত কণ্ঠে সেই বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের মহিমাকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। এই যে বৎসরে বৎসরে মাঘোৎসবের ভিতর দিয়া ভগবান আমাদিগকে নিবিড় প্রেমের মধ্যে মিলিত হইবার একটী সুন্দর অবসর প্রদান করেন, ইহার গুরুত্ব বড় অল্প নহে। এই শততম ব্রহ্মোৎসবে মিলিতভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য আজ যে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার গুরুত্ব এতই অধিক যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। এই সুযোগের ভিতর, এই অবসরের ভিতর আমি কেবলই ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব, তাঁহার মঙ্গল হস্তের প্রত্যক্ষ স্পর্শ সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি। এই শততম ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মোপাসকদিগের মিলনসভার ভিতর দিয়া, প্রথম প্রথম যে সকল মিলনসভা হইয়াছিল, সেই সকল সভার সুন্দর ছবি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে। ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দে মগ্নপ্রাণ শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কর্ম্মবীর আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য যে সকল মহাপ্রাণ ব্রহ্মোপাসকেরা সর্ব্বপ্রথম এই মিলিত ব্রহ্মোপাসনার বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্য—তাঁহারা ধন্য। মনে পড়ে, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রথম যে মিলিত ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল, সেই উপাসনামণ্ডপে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মুখ হইতে এই উদার বাণী—মূল বিষয়ে ঐক্য, অবান্তর বিষয়ে পার্থক্য এবং সকল বিষয়েই সদয় ভাব—Unity in essentials, difference in non-essentials and charity in all—এই উদার বাণী শুনিতে পাই। মনে পড়ে, এই প্রকার মিলিত ব্রহ্মোপাসনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নামিয়া আসিয়া উপস্থিত সকলের উপরে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেন এবং সমবেত সকলের শ্রদ্ধাভক্তি প্রগাঢ় আকারে তাঁহার অভিমুখে সমুত্থিত হইত—সে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যদি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিতেন যে, তাঁহাদের রোপিত মিলিত ব্রহ্মোপাসনা আমাদের অন্তরের পরস্পরপ্রীতি কিরূপ বর্দ্ধিত করিতেছে, আমাদের পরস্পরের মন হইতে ছোটখাটো পার্থক্যজনিত মান অভিমান দ্বন্দ্বকলহ বিদূরিত করিবার সহায়তা করিতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা আমাদের মস্তকে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে বর্ষণ করতেন।

আর দুই দিন পরেই শুভ ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন অবধি শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। এই শতাব্দীয় ব্রহ্মোৎসবে আজিকার এই মিলিত ব্রহ্মোপাসনার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের পরস্পরের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া পরস্পরের হাত-ধরাধরি করিয়া আমাদিগকে একতার, উন্নতি ও মঙ্গলের পথে এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বেষহিংসা দ্বন্দ্ববিবাদ পদতলে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া মিলিত শক্তিতে অধর্ম্ম ও বিনাশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। পরস্পরের সহানুভূতিপূর্ণ সাহচর্য্যে মিলিতভাবে কার্য্য করিবার উপরেই ব্রাহ্মসমাজের সকল আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্যের আদান-প্রদান ভগবানের মঙ্গল বিধান। আহারে বিহারে, জ্ঞান অর্জ্জনে বা ধর্ম্মলাভে, সকল বিষয়েই পরস্পরের সাহায্যের আদানপ্রদান অনিবার্য্য। জগতের ইতিহাসেও দেখা যায়, যে জাতিতে বা সমাজে পরস্পরকে সাহায্য করিবার ভাব যত কম, সেই জাতি বা সমাজ

* শততম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে দুই মাঘ আলবার্ট হলে বিবৃত।

ততই হীনবল, এবং যে জাতিতে বা সমাজে সাহায্য করিবার ভাব প্রবল, সেই জাতি বা সমাজ উন্নতির পথে তত দ্রুতগতি অগ্রসর হয়। ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবকালে মৈত্রীভাব, পরস্পরকে সহায়তা করিবার ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই অল্পকালের মধ্যেই দেশবিদেশ ব্যাপ্ত করিয়া ইহার প্রবল প্রতাপ অনুভূত হইয়াছিল। অল্পকালের মধ্যেই জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই ইহা একটা প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

আজ শততম ব্রহ্মোৎসবের এই মিলনক্ষেত্রে ভগবানের নামে আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী আবার সমভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, দেশবিদেশের চারিদিক হইতেই মিলনের ক্ষুদ্রবৃহৎ শত শত নির্ঝর নিঃসৃত হইয়া প্রবল বন্যার আকারে জগতকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। আমরা যে সত্যধর্ম্মের পতাকা বহন করিয়া অমৃতধামের যাত্রী হইবার পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি, তাহারও মূল প্রাণ মৈত্রীসাধন। তাই উদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া আমাদেরও সকলকে একপ্রাণ একহৃদয়ে মিলিতে হইবে। আজ এই নবজাগরণের দিনে সেই পরম পুরুষ ভগবানকে একমাত্র পিতামাতা জানিয়া জীবনকে ধন্য কর এবং শুধু কথায় নয়, কাজেও মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং—এক হৃদয়ে চল এবং একপ্রাণে কথা বল। বর্ত্তমান শুভ অবসরে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া, সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। বর্ত্তমান জাগরণকে আরও জাগ্রত করিয়া তোল।

আমরা যদি ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল বলিয়া জানি; ব্রাহ্মসমাজকে যদি আমরা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উৎস এবং সকল কল্যাণের মূল বলিয়া মনে করি; ইহা জানিয়া ব্রাহ্মসমাজকে যদি আমরা সকল প্রকার অমঙ্গল অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি; ব্রাহ্মসমাজকে যদি সত্যই আপনার মনে করিয়া তাহাকে অকালমৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইতে ইচ্ছা করি, তবে নিশ্চয়ই মৈত্রীভাবকেই আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক করিয়া তুলিতে হইবে। এখন আমাদিগকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে যে, বিরোধ-বিবাদের সময় চলিয়া গিয়াছে, বৃথা বাদবিসম্বাদের সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদিগকে মিলিতভাবে পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধ দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে; মৈত্রীকে সহায় করিয়া ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া অধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে।

মূল বিষয়ে আমাদের ঐক্য রাখিতে হইবে। ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ উপাসনা দ্বারা মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূল বীজমন্ত্রে একমত হইয়া জীবনের পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ে থাক না কেন শত মতভেদ। উপাসনা-প্রণালী, অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ বিষয়ে চলুক না কেন মতামত লইয়া তর্কবিতর্ক বাদবিসম্বাদ। কিন্তু ঈশ্বরভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, লোকহিতৈষণা প্রভৃতি ধর্ম্মের যাহা সার, সেই সকল বিষয় দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের একত্র মিলিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র হইতেছে—ঈশ্বরকে প্রীতি করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াই তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই উদারতম ধর্ম্মবীজ এবং তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত মহান উদার ধর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিয়াছি, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসনার ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তখন মৈত্রীভাবকে আমাদের সকল কার্য্যের পশ্চাতে দূরে সরাইয়া রাখিলে চলিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি আমাদের নিজেদের জীবনে প্রতিপালিত দেখিতে চাই; ব্রহ্মোপাসনাকে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত যদি সত্যই আমরা অন্তরে পোষণ করি; ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও চরিত্রে যদি সন্তানগণকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শে লব্ধপতিষ্ঠ দেখিবার ইচ্ছা রাখি; অবসাদগ্রস্ত ব্রাহ্মসমাজকে যদি নবজীবনে উৎফুল্ল দেখিতে চাই; তবে স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া, সঙ্কীর্ণভাবকে নির্ম্মূল করিয়া, অহঙ্কারকে বিচূর্ণ করিয়া মৈত্রীভাবকেই আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক করিতেই হইবে।

অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মই হইল মৈত্রীভাবের শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি। এই সত্যধর্ম্ম জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই ফুটিয়া উঠিতেছে, মৈত্রীভাবও ততই অভিব্যক্ত হইয়া জাগ্রতভাব ধারণ করিতে চলিয়াছে। এই সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইলে কিছুতেই বিবাদ আসিতে পারে না। বিশ্বজগত ব্যাপ্ত করিয়া যে সত্যধর্ম্ম দাঁড়াইয়া আছে, তাহা লইয়া কি প্রকারে বিবাদ আসিবে? ঈশ্বর আছেন, ইহার উপর বিরোধ আসিতে পারে না; ঈশ্বরকে প্রাণ মন দিয়া ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, একথা লইয়াও বিবাদ আসিতে পারে না। সেই সর্ব্বব্যাপী সত্যকে যখন সীমাবদ্ধ সংসারে নামাইয়া আমাদের সীমাবদ্ধ কার্য্যে প্রয়োগ করিতে চাই, তখনই বিরোধের সম্ভাবনা আসে।

বিরোধ-বিবাদ দূর করিয়া মৈত্রীভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে আমাদিগকে ঐ অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের উপর, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের উপর দাঁড়াইতে হইবে; সংসারে তাহার প্রয়োগপ্রণালীর উপর বেশী ঝোঁক দিলে চলিবে না। আমাদের স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, ভগবান এক, কিন্তু তাঁহার অনন্ত শক্তি অসংখ্য মানবে অসংখ্য আকারে নামিয়া আসিতেছে। সুতরাং সহস্র মতভেদ সত্ত্বেও কাহাকেও ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের নাই; অথবা এই অসংখ্য মানবকে ছোটখাটো মতামত বিষয়ে বলপূর্ব্বক আমাদের সহিত এক ও অভিন্ন করাইবার অধিকারও নাই। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই চাহে যে, তাহার বহিঃস্থিত প্রত্যেক ধর্ম্মই তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক মতে, প্রত্যেক ক্রিয়াপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ সায় দিবে; সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই চাহে যে, প্রাণে যত মিল হোক আর নাই হোক, সকলেই তাহার বহিরঙ্গে সায় দিক। কিন্তু সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে, সকলে মূলভাবে, বীজমন্ত্রে একমত হোক, প্রাণে একমত হউক, কিন্তু অন্যান্য অবান্তর বিষয়-

সকলে যথাযথ স্বাধীনতা অব্যাহত থাকুক। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে, ভগবানের নামে যেন আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী সমানভাবে ঝঙ্কার দিয়া ওঠে, এবং আমাদের সকল কার্য্যই স্বাধীনভাবে প্রত্যেকের নিজের নিজের উপযোগীরূপে করিবার অধিকার থাকিলেও যেন সে সমস্তই তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুগত করা হয়।

সত্যধর্ম্মের এক অঙ্গ ভগবানকে প্রীতি করা—এটা আমাদের প্রত্যেকের নিজের প্রাণের কথা, এবং ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ। সত্যধর্ম্মের বহিরঙ্গ হইল তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। এবং বহিরঙ্গই হইল মৈত্রীভাবের সাধনাক্ষেত্র। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে যেমন আমাদের নিজেরও শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, তেমনি অপরাপর সাধুভক্তজনেরও নিকটে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আবার, সিদ্ধির পথে যাহা লাভ হইবে তাহাও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাঁটিয়া নিতে হইবে। একদিকে আমাদের নিজেদের হৃদয়কে বিশ্বজগতের সহিত একসুরে বাঁধিতে হইবে, অপরদিকে ভাইবন্ধু দেশবাসী সকলেরই হৃদয়কে সেই সুরের সঙ্গে সমতানে ঝঙ্কার দিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। শত মতভেদ সত্ত্বেও বিবাদবিসম্বাদকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দূরে রাখিতে হইবে; শত মতভেদ সত্ত্বেও অন্তরে দ্বেষহিংসাকে স্থান দিতে পারিব না।

মৈত্রীসাধনের পথে অগ্রসর হইলে, আমাদের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা নব-বলে বলীয়ান হইতে পারিব। এই সদ্ভাব ও শান্তি অপেক্ষা সংসারে ভগবানের শ্রেষ্ঠতর আর কোন আশীর্ব্বাদ আছে কি না সন্দেহ। মৈত্রীসাধন এবং তাহারই পরিণামে শান্তি ও সদ্ভাবস্থাপন সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণসাধনের অনুকূল। সমাজে বল, জাতিতে বল, বা গৃহে বল, সর্ব্বত্রই বিরোধ-বিবাদ বিষকীটের ন্যায় সকল কল্যাণের মূল বিনষ্ট করে। আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ববিবাদ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মুখের শতাব্দীতে মিলিত শক্তিতে পূর্ণ উদ্যমে ভগবানের উপাসনাপ্রচারে দৃঢ়সংকল্প হই। এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে যাহাতে কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, সকল কার্য্য সকল প্রতিষ্ঠান সত্যধর্ম্মের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে সজীব রাখিতে চাহিলে, ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে চাহিলে কেবল ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও, যেখানে যে কোন ক্ষেত্রে শুভকার্য্য ও কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে, নিজের স্বার্থের প্রতি দৃকপাত না করিয়া এবং সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই সকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজকে যোগদান করিতে হইবে—বীজমন্ত্রের অপ্রতিকূল অনুষ্ঠান আচার-ব্যবহারকে নিজের অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে হইবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মৈত্রীসাধনের সুন্দর অবসর আসিয়াছে। প্রেমের যুগ আসিয়াছে। ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন কথাকাটির উপর আর সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। কেবল ঈশ্বর আছেন জানিয়া কোনই লাভ নাই। তাঁহার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। সংসার-অরণ্যের কণ্টকে যাহারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদিগকে সত্যসত্যই প্রাণের মধ্যে স্থান দিতে হইবে, ভ্রাতৃবন্ধনে নিজের বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে, এবং রস-স্বরূপ ভগবানের অমৃত নাম শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, ঈশ্বরের পথে অটলভাবে দাঁড়াইয়া ভাইবন্ধু সকলকে সেই সরল পথ দেখাইতে হইবে। এক সময়ে যে শক্তিবলে ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত বিশ্বসমাজে সত্যধর্ম্মের আগুন ছড়াইতে পারিয়াছিলেন, আমাদিগকে আবার সেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া মৈত্রীভাবের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। একমাত্র ভগবানের মঙ্গল দৃষ্টির উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া দেশের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন আর ভেদাভেদ করিবার অবসর নাই। কে স্পৃশ্য, কে অস্পৃশ্য, কে উচ্চ আর কে নীচ, সে প্রশ্ন করিবার অবসরই নাই। এই সুন্দর অবসরে দেশের মধ্যে মৈত্রীভাবের ধারা বহাইয়া দাও, প্রেমের নদী বহাইয়া দাও এবং বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের নাম মহিমান্বিত কর।

আজ এই শততম ব্রহ্মোৎসবে ভগবানের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে, সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে আমাদিগকে মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। হিংসাদ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া, উচ্চ-নীচ ক্ষুদ্রবৃহতের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া আমাদের পরস্পর মিলিতেই হইবে। সংশয়াত্মা সংসারী লোকের কথায় বিচলিত হইও না। আমাদের যিনি একই পিতামাতা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া, আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছেন—পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিও না—মিলিত হও। ঐ অনন্ত আকাশ হইতে সেই মঙ্গলবাণীরই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছে—মিলিত হও—মিলিত হও। যে সংহতি কার্য্যসাধিকা, যে মিলনে সকল কার্য্য সাফল্যলাভের পথে অগ্রসর হয়; যে মিলনের পরিণামে বলবীর্য্য লাভ হয়, এই শততম ব্রহ্মোৎসবে অদ্যকার এই শুভ মিলন যেন সেই মিলনে পরিণত হয়; এই মিলন যেন আমাদের কথায় ও কার্য্যে এক হয়। আজ এই উৎসবমন্দিরের ভিতর দিয়া যদি আমরা আবার ভায়ে-ভায়ে মিলিতে পারি, তবে এই ব্রহ্মোৎসব সার্থক হইবে, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইবে। সেই মিলনের উপর দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিবেন, এবং ভগবান তাঁহার নিত্য আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

আজ এই শততম মহামহোৎসবের ভিতর দিয়া আমাদের মিলিতভাবে কথায় ও কার্য্যে সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে শুভ অবসর আসিয়াছে, এই শুভ অবসরে আমাদের নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। ভগবানের মাভৈ-বাণী আকাশের পরতে পরতে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। এই জাগরণের মুখে, আমোদপ্রমোদের মোহে পড়িয়া থাকিয়া, ঘুমের ঘোরে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিলে চলিবে না। সম্মুখের নবশতাব্দীর মুখে বৃথা হাসিখেলায়, অশ্লীল আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকিলে চলিবে না; ভায়ে-ভায়ে বৃথা দ্বন্দ্ববিবাদ করিয়া নিজের শক্তির, দেশের শক্তির অপচয় করিতে দিলে চলিবে না। ভেদাভেদের কথা দূর করিয়া দাও, নৃত্যগীতের কথা পদতলে দলিত করিয়া দাও। জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও। ভগবানের হস্তে ফলাফলের ভার সমর্পণ করিয়া

নিজের মঙ্গলসাধনে, সমাজের ও দেশের কল্যাণসাধনে একমনে একপ্রাণে আপনাকে নিয়োগ কর। দ্বেষহিংসা বিদূরিত করিয়া জ্ঞানে বিদ্যায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে ও অর্থে সকল বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা কর—পরস্পরের প্রতি দক্ষিণমুখ প্রকাশ কর—সহায়হস্ত বিস্তার কর। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণপঞ্চমনির্ব্বিশেষে, সকলের সম্মুখে জ্ঞানলাভের দুয়ার খুলিয়া দাও। ভগবানের অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেশের মস্তকে ঝরিতে থাকুক; দেশ সজীব হইয়া উঠুক, এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যে সকল সদ্‌গুণের আধার হইয়া উঠুক। সমগ্র দেশে আনন্দের সুবিমল হাসি এবং শুভ অনুষ্ঠানের মঙ্গল শঙ্খ আবার বাজিয়া উঠুক।

এস, আমরা মিলিতকণ্ঠে এই মিলনোৎসবের যিনি দেবতা, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সেই মহান দেবতা পরমেশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া জীবনকে ধন্য করি। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় হইতে এবং সমবেত কণ্ঠ হইতে ভগবানের নামে এই জয়ধ্বনি সমুত্থিত হউক—জয় ভগবানের জয়।*

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

Invocation

(Sadananda Sj Kali Prasanna Biswas)

[গত ১০ই মাঘ শুক্রবার সায়ংকালে আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় ইংরাজী ভাষায় যে উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহার উদ্বোধন ও উপদেশ নিম্নে যথাক্রমে প্রকাশিত হইল। }

We have assembled here today, on the memorable occasion of the hundredth anniversary of the Theistic Church in India, founded by the late illustrious Raja Ram Mohun Roy, of blessed memory, of Bengal. This is a day of rejoicing not only for the members of the Brahmo Samaj, (the Theistic Church), but for all Indians, nay for the whole world. The new spirit, that we find now manifested in every religious body—the spirit of catholicity and toleration—the spirit of unity and brotherhood—the spirit of love and humanity—the spirit of work and service—the spirit of universal faith and charity—the spirit of nationalism and self consciousness—owes a great deal to the movement inuagurated by the great founder of the Brahmo Samaj. We, therefore, think it our first duty to commence our proceedings of today with a grateful and reverential remembrance of Raja Ram Mohun Roy. Next to him, our homage is due to the late Maharshi Devendra Nath Tagore, who having realised Brahman in self, had elevated the devotional side of the Theistic Church to so great an extent that he became worthy of the name of Maharshi, and was acknowledged by the members of all communities in India as such. Then we must not forget to pay our humble tribute to the late Brahmananda Keshud Chundra Sen, the beloved disciple of the Maharshi, whose devotion towards the cause of the Brahmo Samaj cannot be gain-said. Then we should pay our respectful tribute and reverence to the venerable Pandit Siva Nath sastri, and all the departed and living enthusiasts of the Brahmo Samaj, who sacrificed their everything for the cause of Theism. We also offer our most respectful namaskars to all the Theistic missionaries of the world, to the Acharyas, and members of all the Theistic Churches in India and abroad who are keeping the flag of our church unfurled in every part of the world. Our heart next turns with adoration to the feet of the saints and prophets of all nations, of all religions and of all times all those that have passed the pale and all those who are in the land of living here on earth, who have contributed directly or indirectly to mould, shape and develope the views and thoughts of the Brahmo samaj. There are many members of other religions, who, although they have not the courage enough to come to the fold of our church for some reason or other, have practically broken the limits of bigotry and sectarianism, and accepted the principles of the Brahmo samaj in heart. To them also, we send our greetings, May they be with us today present in spirit on this auspicious occasion !

To you, our young friends, the future torch-bearers of our beloved church, we offer our most sincere and heartfelt love and blessings, May the Divine Light descend on you and make you worthy of the trust we impose on you with full confidence ! The old workers of our samaj are now worn out. They have done their duty, the most strenuous duty, during the critical days of our movement, and done it exceedingly well, for which they deserve your thanks. May God bless them ! They now want rest, the well deserved rest, I should say, and it will be cruel on your part to inflict on them any

* শততম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই মাঘে বিবৃত।

more pressure. They should now be allowed to take rest and watch and guide you. You should now relieve them and take up their work in your own hands. Let the flag of the Brahmo samaj be unfurled by you in every part of the world already approached or not! Let you be blessed with the sadhana of Maharshi, and eloquence of Keshub! Let your lives be dedicated lives like that of Pandit sivanath! Let your energy be always evergreen as that of our friend Krishna Kumar! Let you be successful in uniting the whole world under the banner of the Theistic Church! Let your young blood infuse a new spirit in the service of One God without a second and thereby fulfil the desire of the founder of the Brahmo samaj! This is our most ardent prayer.

Let us now invoke the blessings of the Almighty and Omnipresent God. May He be manifest here to accept our humble prayers and offerings!

Message to Young India.

INDIA is now coming under a psychic change. A momentous change awaits the country in the near future. You that are young have, therefore, a most sacred duty, a most responsible and difficult task before you. Will you rise equal to the occasion?

Then must you prepare yourselves and acquire the necessary *Shakti* which will make India great again. I by no means underrate physieal *Shakti* which Patanjali regards as a preliminary stage of *Yoga*. The Rishis spoke not without reason of *Hotayoga*, *pranayam* &c. The physical *shakti* helps in maintaining health of the body and so helps the concentration of mind. Physical *shakti* is necessary: but we must not confound it with brute force which robs man of all his finer qualities, and turns him into a beast. The real physical *shakti* is non-violence and not violence.

These are days of revolutions, but a revolution does not necessarily mean violence. India needs a revolution but of a higher character. India neebs a spiritual revolution which will remove all the dirt and rust from our religions all the accumulations of ages. Violence will not help India. In the words of Mazzini "The world-Spirit calls her to the service of humanity", and violence is not service. The life of India should be a life in the Spirit—the creative-spirit and not one of brute force. The *skakti* of India now lies hidden, imprisoned, suppressed. You must release it and utilise it for the service of your Motherland—nay of the whole world. In order to do so, you must have strong and unwavering faith in God, and you should have clean hearts and unbending will. Let God be your guiding star; let love be your weapon of war; let service be your aim and aspiration; and let sacrifice be your coveted victory.

India's religion is *Nishkam Dharma*. Develope the Soul-force within you and be inspired with the *Skakti* before which the strongest material power will benought, all diplomaey will vanish and all communalism will disppear. This was the secret of Mazzini, who liberated Italy, it was the sarength of Vashista who defeated Viswamitra and his powerful army, it is the only weapon with which Mahatma Gandhi has captured the heart of India.

I know it is difficult to persuade a man of the present day to believe it. Materialism has shaken his faith in religion. He struggles for worldly pleasures and has no time to think of God—no opportunity to test the power of the Almighty.

Listen to Mazzini: "I do not know speaking historically, a single conquest of the human spirit, or a single important stage for the perfecting of human society", he says, 'which has not had its roots in a strong religious faith. Without God, you can coerce, but you cannot persuade; you may be tyrants in your turn, but you cannot be educators and apostles.

"Without religion,—deep, heartfelt, vitalising religion, there can be no true community. Materialism had been tried, and had failed—failed because it was "an individualist, cold calculating doctrine, that slowly, infallibly extinguished every spark of high thinking or free life, that first plunged men into the worship of success, then made them slaves of triumphant violence and the accomplished fact. It

killed enthusiasm in the individual; it killed true greatness in a nation."

Materialism was not the aim of our Rishis before whom the most powerful monarchs trembled. Materialism cannot bring salvation to a country. Materialism has given the West only wars, strifes and confusion, which the people there now deplore. Even in our unfortunate country the very advent of materialism has been signalled by communal and other strifes, troubles, disorder and insecurity. Therefore I say:—materialism will be of no help to us at any time. India needs the spiritual force which alone will achieve our salvation.

The leaders of the materialistic world are now gradually realising that they have gone too far, and they must cry halt. This has given rise to the League of Nations, and if today all the talk of world peace, disarmament &c., has not achieved success, the reason is not far to seek: they are still struggling in a boat without a spiritual helmsman in the fierce and troublous waters of materialism.

This should be a lesson to you, young men of India,—this should convince you of the superiority of spiritual force over material power-intoxication. The spiritual force is everlasting and eternal but the material power is transitory and limited to time, and sooner or later it must collapse like a house of cards having no solid foundation in religion and God.

I want you, young men, therefore, to profit by what is before you and cultivate the real *shakti* the Spiritual Shakti, India needs at present. You must determine once for all whether you should follow your Rishis of old, who had raised India to the highest pinnacle of civilization, or the materialistic culture of Marx, Mussolini and Stalin, leading the world to a path of destruction.

Your must remember that a Nation is in Mazzini's noble words "a God appointed instrument for the welfare of the race, and in this alone its moral essence lies. Countries are but the workshops of humanity and a Nation is a living task, er life is not her own, but a force and a function in the universl Providential scheme". "Humanity is a great army," said Mazzini, "to the conquest of unknown lands, against enemies both strong and cunning. The peoples are its corps, each with its special operation to carry out, and the common victory depends on the exactness with which they execute the different operations."

I find to my great distress, that in this land of the Rishis some of our young leaders want to banish religion and God from the country. This impending danger, I ask you most solemnly and with all the force I can command, to avoid, if you would do real good to your country,—if you would save pour country, your dear Motherland, from a dire calamity.

India's patriotism must be based on religion. India, the Land of the Rishis and Prophets, has given inspiration to the world. Let you not forget thaa India has a great mission—a moral duty—a solemn responsicility not only to her own people but to the whole world.

Let your patriotiom be silent and manly, hating display and talk; and bright with a spiritual flame that will neither be "roared to heaven nor sunk in ashes". I want you to create that irresistible moral and spiritnal force, by which you will not only be able to raise your own Motherland but the whole world, that now lies prostrrte in depths of materialism,

"O my brothers, love your country. Country is our home, the house that God has given us, settling thereon a populous family, to love us and be loved by us, to ukderstand us and be understand by us better and more readily than others are". These are the burning words of patridism with which Mazzini inspired young Italy to save his country. I repeat ahese memorable words to you. Love your country, love the noble tradition of your country, and be good to humanity. Your Risihis have taught you, thar love is the divine weapon with which the whole world can be conquered. Your conquest should be conquest of love. Love God, love your religion, love your country and love humanity. This is the ideal of India life placed before you by your saints and prophets.

Patriotism is love. It is sacred and unselfish. It is based on truth and righteousness. Its soul is God, its body is religion, and the limbs are we all the people. A true patriot's heart is saturated with the love-spirit, which is not confined to one country or one nation alone, but embraces humanity as a whole. I do not want you to sacrifice yourselves at the altar of Godless creeds. "Be good, be good" advised Mazzini to his young friends. My adviee to you is also, "Be good, be exceedingly good and serve humanity with your goodness". Startle the whole world with India's conception of true patriotism. Love your own country and love also other countries. This is the idea of patriotism I have cherished throughout my life; this is the conception of patriotism before which I have bowed down my humble head in reverence; this is the patriotism which should be the shrine of your heart's temple.

Rise up O! sons of the East! rise up from your long slumber, and make yourselves ready for the spiritual conquest of the world. Let your *Sadhana* subjugate materialism as Lord Buddha subjugated Mara. In your hands lies the final salvation of the Motherland. And in there lies the hope of the world. This is not a dream. I see a clear vision before me—I hear a distinct voice within me. Therefore I say to you:—awake! arise! and claim the heritage of the Rishis. Believe me the final victory, the final glory are yours. But on this one condition that you are true to India and her spiritual ideal, true to the Rishis and there inspiration.

Sadananda—
Editor, the Message.

১১ই মাঘের উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান আজ ভারতভূমিতে যে নবজাগরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার প্রবল বেগ প্রতিরুদ্ধ করে কাহার সাধ্য? সমগ্র বিশ্বের প্রাণ হইতেও এই জাগরণের অনুকূল এক আশ্চর্য্য পবনহিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। এই নব জাগরণের দিনে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। শুভ ভাব ও চিন্তা, শুভকর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে নব জাগরণের পথে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে দ্রুতবেগে চলিয়া যাও। অগ্রসর হইলেই জীবন লাভ এবং নিদ্রা ও আলস্যের ক্রোড়ে শয়ন করিলে মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য্য।

এই নব জাগরণের মূলপ্রাণ স্বাধীনতার আকাংক্ষা। ইহা চিরন্তন ও অক্ষয়, কারণ ইহা প্রতি মানবের অন্তরে ভগবৎপ্রদত্ত জন্মগত অধিকার। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার মধ্যে বাস করিবার ফলে আমরা স্বাধীনতার মর্য্যাদা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি, এবং কুসংস্কার প্রভৃতির গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতাকে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করি। পরাধীনতা সর্ব্ববিধ দুঃখ ও অমঙ্গলের নিদান এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে, ইহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত অক্ষয় উৎস হইতে স্বাধীনতা-স্রোত প্রবাহিত হইতে বিরত হয় নাই।

আজ একশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ঐ বিশালবপু ও বিরাটহৃদয় দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন যে, এই স্বাধীনতা-স্রোতকে বৃথা রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সময়ে ইহার সংহত বেগ ভারতের বৈশিষ্ট্যকে কোথায় ধুইয়া লইয়া যাইবে। তাই তিনি ঐ সকল গণ্ডী ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতাস্রোতকে সরলপথে বহিতে দিয়া ভারতভূমিকে এবং সমগ্র জগতকে শস্যশ্যামল করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

স্বাধীনতার মূল উৎস একমাত্র ভগবান। স্বাধীনতার অর্থ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতা জীবন আনয়ন করে, দেহে মনে ও আত্মাতে শক্তি ও তেজ সঞ্চার করে; উচ্ছৃঙ্খলতা দেহ মন ও আত্মার শক্তি ও তেজ হরণ করিয়া মানুষকে মৃত্যু ও বিনাশের পথে লইয়া যায়। স্বাধীনতা মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত অমোঘ শক্তি; উচ্ছৃঙ্খলতা মানবপ্রবর্ত্তিত ধ্বংসসাধক প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা। দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায় ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ঐ স্বাধীনতাস্রোতকে ভগবদুপাসনার পথে পরিচালিত করিয়া দেশের নবজাগরণকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যের গুরুত্ব সাধারণ দেশবাসী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রচারিত সত্যসকল শতাব্দী পরে তাঁহার দেশবাসীর নিকটে উদ্ভাসিত হইবে।

killed enthusiasm in the individual; it killed true greatness in a nation."

Materialism was not the aim of our Rishis before whom the most powerful monarchs trembled. Materialism cannot bring salvation to a country. Materialism has given the West only wars, strifes and confusion, which the people there now deplore. Even in our unfortunate country the very advent of materialism has been signalled by communal and other strifes, troubles, disorder and insecurity. Therefore I say:—materialism will be of no help to us at any time. India needs the spiritual force which alone will achieve our salvation.

The leaders of the materialistic world are now gradually realising that they have gone too far, and they must cry halt. This has given rise to the League of Nations, and if today all the talk of world peace, disarmament &c., has not achieved success, the reason is not far to seek: they are still struggling in a boat without a spiritual helmsman in the fierce and troublous waters of materialism.

This should be a lesson to you, young men of India,—this should convince you of the superiority of spiritual force over material power-intoxication. The spiritual force is everlasting and eternal but the material power is transitory and limited to time, and sooner or later it must collapse like a house of cards having no solid foundation in religion and God.

I want you, young men, therefore, to profit by what is before you and cultivate the real *shakti* the Spiritual Shakti, India needs at present. You must determine once for all whether you should follow your Rishis of old, who had raised India to the highest pinnacle of civilization, or the materialistic culture of Marx, Mussolini and Stalin, leading the world to a path of destruction.

Your must remember that a Nation is in Mazzini's noble words "a God appointed instrument for the welfare of the race, and in this alone its moral essence lies. Countries are but the workshops of humanity and a Nation is a liviug task, er life is not her own, but a force and a function in the universl Providential scheme". "Humanity is a great army," said Mazzini, "to the conqnest of unknown lands, against enemies both strong and cunning. The peoples are its corps, each with its special operation to carry out, and the common victory depends on the exactness with which they execute the different operations."

I find to my great distress, that in this land of the Rishis some of our young leaders want to banish religion and God from the country. This impending danger, I ask you most solemnly and with all the force I can command, to avoid, if you would do real good to your country,—if you would save pour country, your dear Motherland, from a dire calamity.

India's patriotism must be based on religion. India, the Land of the Rishis and Prophets, has given inspiration to the world. Let you not forget thaa India has a great mission—a moral duty—a solemn responsicility not only to her own people but to the whole world.

Let your patriotiom be silent and manly, hating display and talk; and bright with a spiritual flame that will neither be "roared to heaven nor sunk in ashes". I want you to create that irresistible moral and spiritnal force, by which you will not only be able to raise your own Motherland but the whole world, that now lies prostrrte in depths of materialism,

"O my brothers, love your country. Country is our home, the house that God has given us, settling thereon a populous family, to love us and be loved by us, to ukderstand us and be understand by us better and more readily than others are". These are the burning words of patridism with which Mazzini inspired young Italy to save his country. I repeat ahese memorable words to you. Love your country, love the noble tradition of your country, and be good to humanity. Your Risihis have taught you, thar love is the divine weapon with which the whole world can be conquered. Your conquest should be conquest of love. Love God, love your religion, love your country and love humanity. This is the ideal of India life placed before you by your saints and prophets.

Patriotism is love. It is sacred and unselfish. It is based on truth and righteousness. Its soul is God, its body is religion, and the limbs are we all the people. A true patriot's heart is saturated with the love-spirit, which is not confined to one country or one nation alone, but embraces humanity as a whole. I do not want you to sacrifice yourselves at the altar of Godless creeds. "Be good, be good" advised Mazzini to his young friends. My adviee to you is also, "Be good, be exceedingly good and serve humanity with your goodness". Startle the whole world with India's conception of true patriotism. Love your own country and love also other countries. This is the idea of patriotism I have cherished throughout my life; this is the conception of patriotism before which I have bowed down my humble head in reverence; this is the patriotism which should be the shrine of your heart's temple.

Rise up O! sons of the East! rise up from your long slumber, and make yourselves ready for the spiritual conquest of the world. Let your *Sadhana* subjugate materialism as Lord Buddha subjugated Mara. In your hands lies the final salvation of the Motherland. And in there lies the hope of the world. This is not a dream. I see a clear vision before me—I hear a distinct voice within me. Therefore I say to you :—awake! arise! and claim the heritage of the Rishis. Believe me the final victory, the final glory are yours. But on this one condition that you are true to India and her spiritual ideal, true to the Rishis and there inspiration.

Sadananda—
Editor, the Message.

১১ই মাঘের উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান আজ ভারতভূমিতে যে নবজাগরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার প্রবল বেগ প্রতিরুদ্ধ করে কাহার সাধ্য? সমগ্র বিশ্বের প্রাণ হইতেও এই জাগরণের অনুকূল এক আশ্চর্য্য পবনহিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। এই নব জাগরণের দিনে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। শুভ ভাব ও চিন্তা, শুভকর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে নব জাগরণের পথে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে দ্রুতবেগে চলিয়া যাও। অগ্রসর হইলেই জীবন লাভ এবং নিদ্রা ও আলস্যের ক্রোড়ে শয়ন করিলে মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য্য।

এই নব জাগরণের মূলপ্রাণ স্বাধীনতার আকাংক্ষা। ইহা চিরন্তন ও অক্ষয়, কারণ ইহা প্রতি মানবের অন্তরে ভগবৎপ্রদত্ত জন্মগত অধিকার। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার মধ্যে বাস করিবার ফলে আমরা স্বাধীনতার মর্য্যাদা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি, এবং কুসংস্কার প্রভৃতির গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতাকে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করি। পরাধীনতা সর্ব্ববিধ দুঃখ ও অমঙ্গলের নিদান এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে, ইহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত অক্ষয় উৎস হইতে স্বাধীনতা-স্রোত প্রবাহিত হইতে বিরত হয় নাই।

আজ একশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ঐ বিশালবপু ও বিরাটহৃদয় দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন যে, এই স্বাধীনতা-স্রোতকে বৃথা রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সময়ে ইহার সংহত বেগ ভারতের বৈশিষ্ট্যকে কোথায় ধুইয়া লইয়া যাইবে। তাই তিনি ঐ সকল গণ্ডী ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতাস্রোতকে সরলপথে বহিতে দিয়া ভারতভূমিকে এবং সমগ্র জগতকে শস্যশ্যামল করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

স্বাধীনতার মূল উৎস একমাত্র ভগবান। স্বাধীনতার অর্থ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতা জীবন আনয়ন করে, দেহে মনে ও আত্মাতে শক্তি ও তেজ সঞ্চার করে; উচ্ছৃঙ্খলতা দেহ মন ও আত্মার শক্তি ও তেজ হরণ করিয়া মনুষ্যকে মৃত্যু ও বিনাশের পথে লইয়া যায়। স্বাধীনতা মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত অমোঘ শক্তি; উচ্ছৃঙ্খলতা মানবপ্রবর্ত্তিত ধ্বংসসাধক প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা। দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায় ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ঐ স্বাধীনতাস্রোতকে ভগবদুপাসনার পথে পরিচালিত করিয়া দেশের নবজাগরণকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যের গুরুত্ব সাধারণ দেশবাসী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রচারিত সত্যসকল শতাব্দী পরে তাঁহার দেশবাসীর নিকটে উদ্ভাসিত হইবে।

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল মুক্তিপ্রদ বাণীসকল আজ একটী প্রকোষ্ঠের চারি কোণের মধ্যে অথবা একটী ব্রহ্মমন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ না থাকিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে—ভারতবাসী জনসাধারণের মর্ম্মে মর্ম্মে মিশিয়া গিয়া সুফলপ্রসূ শতবিধ আকারে প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। আজ শতাব্দী পরে কেবল ভারতবাসী নয়, সমগ্র জগতবাসী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সত্যসকল শুধু বৃহত্তর হিন্দুসমাজের নয়, কিন্তু জগতের সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইতেছে। তাই মনে করি, এই শতাব্দী পরে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত আনন্দ উৎসবের দিন আসিয়াছে।

সত্যধর্ম্মপ্রচারে ব্রাহ্মসমাজের সকল সমাজের সকল সম্প্রদায়ের অগ্রণী হইয়া চলিতে হইবে। যতদিন না ব্রাহ্মসমাজকে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে দেখিব, ততদিন আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জাগরণবাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে ক্ষান্ত হইব না যে, ব্রহ্মোপাসকমাত্রকেই সমস্ত জাতি অপেক্ষা কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, সকল বিষয়ে উন্নত হইতেই হইবে। হিন্দুসমাজও যদি বাঁচিতে চায় এবং প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, তবে ব্রাহ্মসমাজকেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্মের যে নবতর সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সত্যমূর্ত্তিকেও সজীব রাখিতে হইবে।

ভগবানের দান সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সজীব রাখিতে চাহিলে এবং তাহার প্রচারকেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিলে আমাদিগকে নবোদ্যমে নবোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য তত্ত্বসকল ধনীর অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, সুখের সংসারে এবং পাপীর তাপক্লিষ্ট আঁধার প্রাণে, সর্ব্বত্র বহন করিতে হইবে। আমাদের বক্তৃতা উপদেশ প্রভৃতি কেবলমাত্র ব্রহ্মোপাসকদিগের উদ্দেশে দিলে চলিবে না। যে হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই মহত্তর হিন্দুসমাজ এবং বৃহত্তম মানবসমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সকল কার্য্য করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিমান করিতে চাহিলে কেবল শিক্ষিতদের মধ্যে ইহার বিশুদ্ধ মতসকল আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। উচ্চ-নীচনির্ব্বিশেষে, পাপী-সাধুনির্ব্বিশেষে, বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে, নর-নারীনির্ব্বিশেষে, দেশ-বিদেশনির্ব্বিশেষে, জগৎবাসীমাত্রকেই ইহার আশ্রয়ে টানিয়া আনিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় মহত্বপূর্ণ সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবার পথে পদে পদে ভুলভ্রান্তি হইতে পারে; পদে পদে বৃথা ও মিথ্যা নিন্দাবাদ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উপহাসের সুতীব্র বাণ বর্ষিত হইবে; কিন্তু তাহার জন্য কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ হইলে বা কাপুরুষের মত সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে চলিবে না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যের পথে, দিকে দিকে সত্যধর্ম্মের বীজ বপন করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুলভ্রান্তির মূল নষ্ট করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ শত অত্যাচার অবিচার শত অপবাদ উপহাস সহ্য করিয়াও কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া একনিষ্ঠভাবে সত্যধর্ম্মকে অন্তরে ধারণ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমানে জনসমাজে এক আশ্চর্য্য সবল প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই মাঘোৎসব তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবার সুন্দর অবসর। তাঁহাদের জীবন কেবল ব্রাহ্মসমাজের নয়, সমগ্র জগতের ধর্ম্মসমাজের গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের সাধুজীবন পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। তাঁহারা সুখ-সোয়াস্তি অপেক্ষা মন্ত্রের সাধনকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা এখন মন্ত্রের সাধন অপেক্ষা সুখ-সোয়াস্তিকেই অধিক করিয়া দেখি। কিন্তু বিনা স্বার্থত্যাগে, দেশের মঙ্গল ও জাতির কল্যাণরূপ বৃহত্তর স্বার্থের নিকট নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলিদান না করিলে কোনও সদনুষ্ঠান দাঁড়াইতে পারে না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তর হইতে নিঃসৃত এই মহা সত্যবাণী অন্তরে ধারণ কর এবং নির্ভয় হও—"আমাদের সম্মুখে পর্ব্বতসমান বাধা, কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়"। ভয় নাই—ভয় নাই, ভগবানের মাভৈরবের এই শৃঙ্গধ্বনি গগন ভেদ করিয়া আজ শততম মাঘোৎসবে আমাদের কর্ণে ও মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে। চারিদিক হইতে স্বাধীনতার ও মঙ্গলের একটা প্রবল বায়ু বহিতেছে। সকলের সমবেত শক্তিতে এই বায়ুর অভিমুখে পাল তুলিয়া দাও—নিশ্চিন্ত থাকিও, সত্যধর্ম্মের তরণী কখনই ডুবিতে পারে না—কর্ণধার ভগবান তাঁহার সবল হস্তে হাল ধরিয়া আছেন।

যদি তোমাদের সত্যই এই বিশ্বাস থাকে যে, অপ্রতিহতশক্তি ভগবান আছেন, এবং তিনিই এই বিশ্বচক্রের মঙ্গলবিধাতা ও নিয়ন্তা, তবে তাঁহার পতাকাবহনে এবং তাঁহার সত্যধর্ম্মের মন্ত্রশক্তি বিতরণে কার্পণ্য প্রদর্শন করিও না। একনিষ্ঠ হও। ব্রত উদ্‌যাপনে দৃঢ়সংকল্প হও।

ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুও বরণীয়, তোমাদের বিজয়বিষাণে এই অমরবাণী ধ্বনিত করিতে করিতে অগ্রসর হও। কোনপ্রকার ভয়ে ভীত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না, বিরামবিশ্রামের আকাংক্ষা করিও না, আলস্যে ও বিলাসে গা ভাসাইয়া দিও না।

হে অন্তর্য্যামী! বিগতবিবাদং তোমার আবির্ভাবে আমাদের বিরোধী যাঁহারা, তাঁহারাও বিরোধ পরিত্যাগ করুন, এবং আমাদের সমবেত কণ্ঠ হইতে তোমারই জয়ঘোষণার বিপুল আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইয়া গগনের পরতে পরতে প্রতিধ্বনিত হৌক। তোমার আগমনে আমাদের দ্বন্দ্ববিবাদ অপহৃত হৌক, কলহ-বিরোধ শান্ত হৌক। আমাদের পাপতাপ লজ্জাভয় বিনাশপ্রাপ্ত হৌক। তোমার নামে আমরা যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই মাঘোৎসব সার্থক হৌক। *

ব্রাহ্মসমাজের দান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আজ আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সমবেত হইয়াছি। তিনিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। এই মহামহোৎসবে আমাদের হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত করি।

আজ মাঘের শুভ একাদশ দিবস। এই ১১ই মাঘে এই ব্রহ্মমন্দিরে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়—জগতের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এই পুণ্যতীর্থে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। একশত বৎসর পূর্ব্বের এই কথা; আর আজ পূর্ণ একশত বৎসর পরে, সেই মন্দিরে আমরা বিশ্ববিধাতা অখিলমাতা পরমেশ্বরের পূজা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—আমার অন্তরে আনন্দ যে কিপ্রকার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি যখন ভাবি যে, এই মন্দিরের নিম্নতল হইতে এই তৃতীয়তল পর্য্যন্ত প্রত্যেক তলের প্রতি ইষ্টকখানি যথাকালে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষদিগের উচ্চারিত ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই মন্দিরে আমি বসিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবার—শুনিবার ও শুনাইবার অধিকার পাইয়াছি, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

শুনিতে পাই, এই পুণ্যতীর্থ নাকি একটু দূরবর্ত্তী বলিয়া অনেক বালক বৃদ্ধ ও যুবা এখানকার উপাসনায় যোগদান করিতে পারেন না। হিন্দু বা মুসলমান কোন প্রাচ্যবাসীর মুখে একথা আমরা শুনিতেই চাই না। কোথায় বদরিকাশ্রম, আর কোথায় কন্যা কুমারিকা, আর কোথায় মক্কা বা মেদিনা, হাজার হাজার ক্রোশ দূরবর্ত্তী তীর্থসমূহে যাঁহারা পদব্রজে যাইতে কুণ্ঠিত হন না, সেই নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচ্যবাসীর মুখে বা তাঁহাদের বংশধরদিগের মুখে সিকি ক্রোশ বা অর্দ্ধ ক্রোশ প্রভৃতির দূরত্বকে এই তীর্থস্থানে আসিবার বাধা হইবার কথা আমরা শুনিতে চাই না। আমি দেখিয়াছি, নিষ্ঠাবান ব্রহ্মোপাসক বৃদ্ধ ধনী ব্যক্তি সুদূর বেহুয়া অঞ্চল হইতে স্বীয় পৌত্রাদিকে সঙ্গে করিয়া আমৃত্যু প্রতি বুধবার উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগদান করিয়াছেন। প্রাচীন ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, আমাদের দেশের প্রাচীন ধারা বজায় রাখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যোড়াসাঁকো হইতে ভবানীপুর এবং বেহালাস্থ ব্রাহ্মসমাজে সদলবলে পদব্রজে গমন করিতেন, ফিরিবার সময় যানবাহনে চড়িয়া ফিরিতেন। এই শতবার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই পুণ্যতীর্থের উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগদান করুন এবং উপাসনা বা অন্যান্য বিষয়ে যাহা মঙ্গলজনক বিবেচনা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করুন।

আমার ইহা পরম সৌভাগ্য মনে করি যে, আমা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ও শ্রেষ্ঠতর অনেক ব্যক্তি থাকিতেও সেই অকিঞ্চনগুরু মঙ্গলবিধাতা ভগবান শতবার্ষিক মহোৎসব, এই শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার গৌরবপূর্ণ অধিকার এই অকিঞ্চনের উপর সন্ন্যস্ত করিয়াছেন। কোথায় সেই বিশালবপু ও বিরাটহৃদয় রাজা রামমোহন রায়, আর কোথায় বা আমি; কোথায় সেই ধ্যানবীর ব্রহ্মানন্দরসপানে নিমগ্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আর কোথায় বা আমি; কোথায় বা ভক্তিবীর ও কর্ম্মবীর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আর কোথায় বা আমি। পুরাকালে যেরূপ ঋষিরা তাঁহাদিগের যাগযজ্ঞে দেবতাদিগকে আবাহন করিতেন, আজ এই শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসবের মহাযজ্ঞে আমরাও সেইরূপ ঐ সকল মহাপুরুষদিগের আবাহন করিতেছি—তাঁহারা আমাদের এই উৎসবযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আমাদের সঙ্গে একপ্রাণে একহৃদয়ে পরব্রহ্মের জয়কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আমাদের এই উৎসবযজ্ঞকে সফলতা প্রদান করুন।

মানুষের জীবনে একশত বৎসর দীর্ঘকাল মনে হইতে পারে, কিন্তু একটা সমাজের জীবনে, একটা জাতির জীবনে একশত বৎসর বিন্দুপরিমিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু যে ব্রাহ্মসমাজ এই শতবর্ষের মধ্যে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষদিগের জন্মদান করিয়াছে, সে ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত অশ্রদ্ধার চক্ষে দৃষ্টিযোগ্য নহে। এক শতাব্দী মধ্যে যে ব্রাহ্মসমাজ দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল, সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের বীজ রোপণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে ব্রাহ্মসমাজ যে নিশ্চয়ই এক শক্তিকেন্দ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শক্তিকেন্দ্র হইতে শতাব্দী মধ্যে আমরা কি পাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ দেশকে কি দিয়াছেন, জগতকে মঙ্গলের পথে কতটুকু অগ্রসর করিতে পারিয়াছেন, শতাব্দী পরে সে সমস্ত আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে করি।

মানুষ শরীর, মন ও আত্মা লইয়াই মানুষ। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আলোচনা করিতে গেলে, মানুষের

---

* শততম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১১ই মাঘে বিবৃত।

শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দ্য বিধান, মানসিক উন্নতিসাধন এবং ভগবানের সহিত আত্মার আধ্যাত্মিক যোগসাধন, এই তিন বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ দেশকে কি দিয়াছেন, আমাদের তাহাই দেখিতে হইবে। খাওয়া পরার ব্যবস্থা না থাকিলে, অন্নবস্ত্রের যথাযুক্ত সংস্থান না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না। যে দেশে, যে জাতির মধ্যে মানুষ অন্নবস্ত্রের অভাবে মৃতপ্রায় থাকে, সে দেশের মঙ্গল নাই, সে জাতির কল্যাণ নাই। ইহা বুঝিয়া প্রজার সপক্ষে সর্ব্বপ্রথম দাঁড়াইলেন কে? ঐ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা আনিবার ভগীরথ—ঐ রাজা রামমোহন রায়। যখন দেশে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সর্ব্বপ্রথম সংশোধন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল, তখন টাউন হলে সভা করিয়া অধিকাংশ জমীদারের মতের বিরুদ্ধে প্রজাগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক সর্ত্তসমূহের স্বপক্ষে দাঁড়াইলেন কে? ঐ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রমুখ পুত্রগণ। দেশের অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে সভা অগ্রণী, সে সভার মূল সংস্থাপক ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংপৃক্ত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর। মূলত দেশের প্রজাসাধারণের জন্য যে সভা সংস্থাপিত হইল, সেই সভার মূল সংস্থাপক ঐ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংপৃক্ত, স্বাধীনতার ভাবে পরিপুষ্ট আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রভৃতি। যে সতীদাহ প্রকারান্তরে নারীহত্যায় দাঁড়াইয়াছিল, সে সতীদাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন কে? ব্রাহ্মসমাজেরই দুই কর্ম্মবীর—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর।

ইহা তো জানা কথা, বাল্যবিবাহ বল, বহুবিবাহ বল, এই সকল সামাজিক কুপ্রথা নিবারণেও অগ্রণী হইয়াছিলেন—ঐ ব্রাহ্মসমাজ। বর্ত্তমান বিধবাবিবাহের সপক্ষে যে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে, সেই বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন জন্য যিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, সেই দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মসমাজেরই ভাবে পরিপুষ্ট ছিলেন—বহুকাল যাবৎ তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজই এক হিন্দু-খৃষ্টপন্থীকে তাঁহার প্রার্থনামত পুনরায় হিন্দু ব্রহ্মপন্থী-রূপে গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সাধনের পথ বহুকাল পূর্ব্বে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এক সময়ে যখন সুরাপান শিক্ষিত সমাজের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়া মহামারীর ন্যায় উহাকে নির্মূল করিতে বসিয়াছিল, তখন কে তাহার বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলিত করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া সাড়া পাইয়াছিলেন?—কে তিনি?—ঐ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। আজ যে দেশের সর্ব্বত্র রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সুবিস্তৃত দেখিতে পাই; ঐ সকল সেবাশ্রমের সেবকগণকে অক্লান্তভাবে ও গ্লানিমুক্ত প্রাণে রোগশোকে ক্লিষ্ট দেশবাসী জনসাধারণের সেবা করিতে সমুদ্যত দেখি, তাহার আদর্শ কে সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল? ঐ কয়েকজন ব্রাহ্মযুবকের প্রতিষ্ঠিত দাসাশ্রম। দাসাশ্রম স্থাপনের পূর্ব্বে, পথের ধারে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, রোগক্লিষ্ট এমন কি, কুষ্ঠরোগীদিগেরও সেবায় যে দেশবাসী আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, একথা কাহারও ধারণাতেই আসে নাই। বর্ত্তমানে অসংযত স্ত্রীস্বাধীনতার নামে অল্পবিস্তর উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়াছে সত্য; কিন্তু ঐ যে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগে আর্য্যঋষিগণের প্রচারিত এবং তাঁহাদের পদানুসরণে জনসাধারণের সেবিত শাস্ত্রসম্মত স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল এবং পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ ব্যবহারের উপদেশ ক্রমাগত দিয়া আসিয়াছিল, সেই সমস্ত মহান ভাব অন্তর্নিগূঢ় ভাবে কার্য্য করিবার ফলে দেশবাসী যখন মাতৃভাব গ্রহণের অধিকারী হইলেন, সেই শুভ মুহূর্ত্তে অর্দ্ধোদয় যোগ দেখা দিল এবং সেই যোগস্নান উপলক্ষে দেশবাসীর পরীক্ষা উপস্থিত হইল; সেই পরীক্ষায় দেশবাসী উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পথে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। নারীগণের শালীনতাবিধায়ক পরিচ্ছদ, যে পরিচ্ছদ মোটামুটি বলিতে গেলে সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই পরিচ্ছদেরও মূলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবার, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা করিবার পথে ব্রাহ্মসমাজই অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন।

কেবল শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যত্নবান হইয়াই ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চেষ্ট হয় নাই। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের ন্যায় মানসিক উন্নতিবিধানেও ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বাগ্রে পতাকা বহন করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হইলে শারীরিক সুখবিধানের ব্যবস্থা কিছুতেই স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারে না। তাই তিনি শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতিসাধনে নিজের শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন বুঝিয়াছিলেন যে, তদানীন্তন দেশীয় পণ্ডিতদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীর ফলে সে তেজ আসিতে পারে না, যাহার সাহায্যে কুসংস্কার ও কুপ্রথাসকল বিধ্বস্ত হইতে পারে। তিনি তাঁহার দূরদর্শিতায় ইংরাজী শিক্ষার সুফল সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে শিক্ষার গুণে দেশবাসী আজ স্বাধীনতাসংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, সেই ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের স্বপক্ষে রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সুপ্রসিদ্ধ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা দেশের শিক্ষিত সমাজের সকলেরই সুবিদিত। একথা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, তদানীন্তন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের শিক্ষা ধরিয়া থাকিলে আজ দেশবাসী স্বাধীনতাসংগ্রামে কখনই নামিতে পারিতেন না—কুপ্রথা ও কুসংস্কারসকল দেশকে আরও কতদিন যে আঁকড়াইয়া থাকিত, কতদিন যে দেশকে উন্নতির পথ হইতে পিছাইয়া রাখিত, তাহা কে বলিতে পারে? আজ যে বঙ্গভাষা এত শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, ঐ রাজা রামমোহন রায়ই তাহার মূল পত্তন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া দেশবাসী শুধু পণ্ডিতদিগের নিকটে নহে, কিন্তু জনসাধারণের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া

দিবে? বঙ্গভাষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ আবশ্যক—ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ঐ রাজা রামমোহন রায়ই তাহার আদর্শ দেশবাসীকে প্রদান করিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পর যিনি ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার হইলেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশবাসী জনসাধারণের নিকট জ্ঞানের পথ উদারভাবে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন—নির্ব্বাধ করিয়া দিলেন। রাজা রামমোহন কিছুদিনের জন্য কৌমুদী নামে একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশ করিলেও বেশী দিন উহা চলে নাই। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গলায় নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতের দেশীয় মাসিক পত্রের জননী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া এবং তাহাকে ভাবরাজির শতভূষণে বিভূষিত করিয়া দেশের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার ও বিতরণের যে কি অনুপম বিধান করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। ভগবানের দয়ায় এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব দেশবাসীর সম্মুখে তাহাদের নিজেদের ভাষায় সমুপস্থিত করেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই দেশবাসীকে সর্ব্বপ্রথম এবং আজ ৮৭ বৎসর ধরিয়া দেশীয়ভাবে ও স্বদেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে দেশবাসীর জীবনের এমন কোন বিভাগ ছিল না, যে বিভাগে ব্রাহ্মসমাজ না মঙ্গলস্পর্শে উন্নতিসাধন করিয়াছিল। দেশবাসীর প্রকৃত উন্নতি চাহিলে কিরূপ বিদ্যালয় করা উচিত; কেবল বিদেশীয় রাশি রাশি সাহিত্য কণ্ঠস্থ করিয়া নয়, কিন্তু ধর্ম্মভিত্তির উপর দেশীয়ভাবে চরিত্রগঠনের সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষা কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই কলিকাতাবাসী সমগ্র শিক্ষিত সমাজের সহযোগে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। বেদ স্ত্রীশূদ্রাদির পাঠ্য নয়, এই অন্যায় বাধা ভাঙ্গিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতেই সর্ব্বপ্রথম বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া নরনারী নির্ব্বিশেষে দেশবাসী সাধারণের সুপাঠ্য করা হইল। ব্রাহ্মসমাজ হইতেই সুলভ মূল্যে সানুবাদ অমূল্য শাস্ত্ররাশি একটার পর একটী প্রকাশিত হইয়া ক্রমাগত আঘাত করিতে করিতে দেশবাসীকে নিজেদের মানসিক উন্নতিবিধানে জাগাইয়া তুলিল। ঐ ব্রাহ্মসমাজের কুসংস্কারমুক্ত ভাবে পরিপুষ্ট মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর অগ্রসর হইয়া শবদেহ স্পর্শ করিবার পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা এত চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় পাইতেছি। এই যে আজ ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা ব্যাখ্যানাদি শুনিতে পাই, ইহার মূলেও ঐ ব্রাহ্মসমাজের প্রদত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান। এই যে আজ চারিদিকে সঙ্গীতচর্চ্চার বন্যা আসিয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভায় সেই "অলখ নিরঞ্জনেই" তাহার সূত্রপাত এবং ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিই তাহার বিস্তৃতির একমাত্র কারণ।

কিন্তু এই যে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে এবং মানসিক উন্নতিবিধানে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী হইয়া পথপ্রদর্শন করিতে পারিলেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহার মূল—আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যখন উপনিষৎ প্রভৃতি ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনই তিনি অন্তরে বুঝিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ যে, মানবমাত্রের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আছে। নরনারীনির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণচণ্ডাল-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই যে ভগবানকে লাভ করিবার অধিকার আছে এবং যে কোন জ্ঞান, যে কোন বিদ্যা তাহার উপায়স্বরূপে সম্মুখে আসিবে, তাহার পথে বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার এই সত্যতত্ত্ব রাজা রামমোহন রায় যে ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই স্বাধীনতার কথা স্পষ্টতম ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া সমগ্র ভারতে এবং সমগ্র বিশ্বজগতে এক ধর্ম্মোজ্জ্বল কর্ম্মোজ্জ্বল নবযুগের প্রবর্ত্তন করিলেন। বেদবেদান্তের ভিতরে প্রবেশ করিয়া এবং শাস্ত্ররাশি অনুসন্ধান করিয়া যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বাণী—ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার নরনারীমাত্রেরই আছে—লাভ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ করিলেন, আশ্চর্য্য এই যে, শত শত বৎসর যাবৎ প্রচলিত ভারতের অন্তরে বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেও, ঐ বাণী সত্য বলিয়াই তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের এবং অগ্রগামী অধ্যাপকদিগের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই সহযোগিতায় ঐ সত্যবাণী আজিকার মত এক শুভ ১১ই মাঘের পবিত্র দিবসে বিঘোষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বে আর কেহই বলিতে পারে নাই বলিয়া, শুনিয়াছি, ঐ ঘোষণার দিনে দেশবাসীর প্রাণে এক আশ্চর্য্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা ঐ স্বাধীনতার মধ্যে লালিত পালিত বলিয়া আমাদের পক্ষে ঐ সাড়ার পরিমাণ করা সাধ্যায়ত্ত নয়। চিরপরাধীন ব্যক্তির স্বাধীনতালাভের ন্যায় দেশবাসী ঐ মুক্তিবাণী শুনিয়া মুক্তির পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিল।

এই মুক্তিবাণীর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া আর একটী অমোঘ শান্তিমন্ত্র দেশবাসীকে দিয়াছেন। সেই শান্তিমন্ত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনাই সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও কল্যাণের আকর। ঐ স্বাধীনতার বাণী এবং ঐ শান্তিমন্ত্র বর্ত্তমান যুগের গতি উন্নতির পথে মঙ্গলের পথে আশ্চর্য্যরূপে ফিরাইয়া দিয়াছে।

এই সকল কার্য্য করিয়াই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন নিঃশেষ হয় নাই। এখনও ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ঘন অন্ধকারের ভিতর আলোকের প্রয়োজন যেমন তীব্রভাবে আমাদের উপলব্ধিতে আসে, সন্ধ্যার আলো-আঁধারের ভিতর নূতন কোন আলোকের প্রয়োজন তত তীব্রভাবে উপলব্ধ হয় না; সেইরূপ বর্ত্তমানে আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত সত্যসমূহের ভিতরে সর্ব্বদা লালিত পালিত ও সর্ব্বথা পরিপুষ্ট হইতেছি বলিয়া উহার প্রয়োজন আমাদের অন্তরে সেই আদিমকালের ন্যায় তত তীব্র আঘাত প্রদান করে না। যে প্রয়োজন লইয়া ব্রাহ্মসমাজ এই বঙ্গদেশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে প্রয়োজন সংসিদ্ধ হইতে এখনও অনেক বাকী আছে। আমাদের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। যে প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, মানবজাতি সাধারণত যতদিন বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, ততদিন ঐ প্রয়োজন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, ঐ প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটা সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলের দীপ্ত দীপ ধারণ করিয়া রাখা আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যের পথে—এদেশবাসীকে এবং সেই সঙ্গে জগৎবাসীকে পরিচালিত করাই ব্রাহ্মসমাজের জন্মগ্রহণের কারণ। এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধনের ইচ্ছা ও আশা যতদিন মানবাত্মার অন্তরে জাগ্রত থাকিবে, ততদিন সেই উন্নতির একটা আদর্শ ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটা সমাজকে মাথা তুলিয়া থাকিতেই হইবে।

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূলকেন্দ্র ভগবান। তাই ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদকেই কেন্দ্রে রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন। এই একেশ্বরবাদকে কেন্দ্রে রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে মূল লক্ষ্য করিয়া মৈত্রীসাধনের সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা সংযত স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। যেদিন আমরা আমাদের ছোটখাটো মনের পরদাসকল ছিন্ন করিয়া সত্যসত্য পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, বিশ্ববাসীকে একই পিতামাতার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিব, সেইদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন নাই বলিলেও বলিতে পারি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নয়। যতদিন না আমরা ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের কেন্দ্র করিব, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া তুলিব; যতদিন না আমরা সকলের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার উপর দাঁড়াইতে পারিব, ততদিন ব্রাহ্মসমাজকে আদর্শদীপ হস্তে অবিচলিতভাবে শত সহস্র নিন্দাঝঞ্চার মধ্যেও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সরল পথ প্রদর্শন করিতে হইবে, স্বাধীনতার অনুপম আনন্দ সাধারণের উপলব্ধিতে আনিতে হইবে এবং মৈত্রীর অপূর্ব্বশক্তি অসাধারণ বল প্রত্যক্ষ করাইতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সমগ্ররূপে সংসিদ্ধ হয় নাই বলিয়া আমাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ এই একশত বৎসরের মধ্যে যাহা করিয়াছে, তাহাই আমাদের হৃদয়কে আশায় পূর্ণ করে, এবং তাহারই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সম্মুখে নব শতাব্দীর মুখে আমাদের হাহুতাশ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার অবসর নাই। আপনাকে জান—আপনাকে অমৃতের সন্তান ও অমরণধর্ম্মা বলিয়া জান—মহান্ অগ্নি পরম পুরুষ হইতে নিঃসৃত এক-একটী মহাশক্তি সজীব বিস্ফুলিঙ্গ বলিয়া জান। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, প্রকৃতিতে যেমন হিমালয়েরও প্রয়োজন আছে, সেইরূপ ধূলিকণারও প্রয়োজন আছে; সেইরূপ ভগবানের ধর্ম্মরাজ্যে আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনেরও স্থান আছে। ব্রাহ্মসমাজে কার্য্যের অভাব বলিয়া ক্ষোভপ্রকাশের কোনই অবকাশ নাই। আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা হইতেই কার্য্যের অভাবের কথার উৎপত্তি হয়। ভগবানের রাজ্যে কার্য্যের অভাব নাই। ব্রহ্মের মঙ্গলস্বরূপে যদি আমাদের স্থির বিশ্বাস থাকে, তবে আমাদের অন্তরে নিরাশা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না। যে পরব্রহ্ম জগতের সকল উন্নতির পরিসমাপ্তি, সেই সত্য পরব্রহ্মকে যদি আমরা অন্তরের সহিত ধরিয়া থাকি, তবে আমাদের অন্তরে নিরাশা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজের নিকটে আমরা যাহা কিছু লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য যদি আমাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জাগিয়া উঠে; সত্যসত্যই যদি আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের মঙ্গলের জন্য, নানাবিধ পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি, তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সমগ্রভাবে সংসিদ্ধ করিবার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি নিয়োজিত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই শতাব্দীর ব্রহ্মোৎসবই তো উপযুক্ত অবসর। ব্রাহ্মসমাজের যিনি দেবতা, তিনি আমাদের বন্ধু। এই শতাব্দী পূর্ণ হইবার অবসরে তাঁহাকেই একমাত্র পিতামাতা জানিয়া এবং তাঁহারই আদেশ জানিয়া উত্থান কর, ধর্ম্মকর্ম্মে রত হও; সন্তানগণকে বাল্যাবধি অশুভ দুর্নীতি হইতে রক্ষা করিয়া জ্ঞানধর্ম্মে চলিবার পথপ্রদর্শন কর। সুখদুঃখ বিপদসম্পদ সকলেরই মধ্যে স্নেহময়ী জননীর মঙ্গলহস্ত উপলব্ধি করিয়া নববল লাভ কর। এই শততম ব্রহ্মোৎসবে আমাদের হৃদয়ে নবতর আনন্দের উৎস খুলিয়া যাক, ভয়ভাবনা অন্তর্হিত হোক। যিনি এই জগৎসংসারকে নিশ্বসিত করিয়াছেন, তিনি যখন আমাদের পরম আশ্রয়, তখন আত্মাকে নিরাশা নিরানন্দে ও দুঃখদৈন্যে মুহ্যমান হইতে দিতে পারি না। এই মহামহোৎসবের মধ্যে আমাদের আত্মা সকলের সম্ভজনীয় সেই পরমাত্মার পবিত্র সংস্পর্শ লাভের অধিকারী হউক।

নিবেদন।

(শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক)

[ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক সপ্তাশীতিবর্ষীয় প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ শততম ব্রহ্মোৎসবে যোগদানে অসমর্থ হইয়া রোগশয্যা হইতে এই সংক্ষিপ্ত 'নিবেদন'টুকু পাঠাইয়াছিলেন; এবং ইহা গত ১৩ই মাঘ সোমবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে উদ্বোধনের পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল।]

আজ বড় শুভ দিন। শতবর্ষ পূর্ব্বে ১১ই মাঘে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা তদুপলক্ষে এই শতবার্ষিক উৎসব করিতেছি। গত ১৩৩৫ সালের ভাদ্রমাসে আর একটি উৎসব হইয়া গিয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মে জ্ঞানযোগে উপাসনা আরম্ভ করেন। বৈদিক

ঋষিরা বহু পুরাকালে জ্ঞানযোগে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। পৌরাণিক যুগে সেই উপাসনা লোপ পায়। মহাত্মা রামমোহন শতবর্ষ পূর্ব্বে ১২৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র তারিখে কমল বসুর বাটীতে সেই পূজা পুনঃস্থাপিত করেন। আর ১২৩৬ সালের ১১ই মাঘে এই নগরে জোড়াসাঁকোর নূতন বাটীতে "ট্রষ্টডীড" সহযোগে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মসমাজ এই উপলক্ষে গত বৎসর হইতে উৎসব করিতেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি জীবিত থাকিয়াও এই উৎসবে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য সশরীরে যোগ দিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমার অধ্যাত্মযোগ সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। ইচ্ছাময়ী মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, তাহার অন্যথা করিবার কাহারও শক্তি নাই। শুধু আমি কেন, ব্রাহ্মসমাজের কত মহাপ্রাণ ত অকালে চলিয়াই গিয়াছেন।

একটা কথা বোধ হয় এসময় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "ব্রাহ্মসমাজের অবসান হইতেছে" আজকল এই একটা ধূয়ো উঠিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক; বরঞ্চ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সমগ্র ভারত গ্রহণ করিতেছে। বাল্যবিবাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ ও অনুন্নত বর্ণদের তুলিয়া লওয়া প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য এখন সমগ্র ভারতে হইতেছে। দীক্ষার্থীর সংখ্যাই কেবল কমিয়াছে মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। এখন ব্রাহ্মসমাজকে কালের অনুগামী হইতে হইবে। যেমন ভারত অগ্রসর হইতেছে, সেই প্রকার ব্রাহ্মসমাজকেও অগ্রসর হইতে হইবে। বরিশালের ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এ কথারও উত্তর যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সমগ্র ভারত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হয় নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজকে অন্য সমাজের সহিত কার্য্য করিতে হইবে। বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভা, রামকৃষ্ণ-আশ্রম, ধর্ম্মাঙ্কুরসভা প্রভৃতি সকল সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজকে মিলিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন-নিবারণ এবং শিক্ষাদান প্রভৃতি সমুদয় শুভানুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজকে সকলের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। তাহা না করিলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও আর্য্যসমাজ প্রভৃতি সকলকে লইয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। ক্রমে মৈত্রীর দিকে পৃথিবী চলিতেছে, উদারতা বাড়িতেছে—ব্রাহ্মসমাজকেও সেই পথে চলিতে হইবে।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

বেদগান।

(সঙ্গীত ভারতী শ্রীবাণী দেবী D. Mus. (Ind.))

খটভৈরবী—ফেরতা (একতালা ও তেওরা)

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসৎ হতে দেব তুমি সত্যে লয়ে যাও মোরে।
আঁধার হতে দেব তুমি দেখাও হে জ্যোতি মোরে।
মৃত্যু হতে দেব তুমি পারে লয়ে যাও মোরে।
স্বপ্রকাশ প্রকাশ হও, চরণে তব শরণ দাও।
দেব হয়ে দখিনমুখ, করি' দূর যতেক দুখ—
রক্ষা কর রুদ্র মোরে—রক্ষা কর নিত্য মোরে॥

সায়ংকাল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাহার—খাওারবাণী চৌতাল।

আজি বন ঘন ফুলে ফুলে ছাইল রে,
তব মধুর সুবাস মন্দ মন্দ মলয়জ সনে বয় হে।
যত ভকতবৃন্দ আসিয়া মিলি' পুঞ্জে
নব নব ফুলহার গাঁথি' দিছে তব পদে শত।—
তোমারি আরতি করি' চিত হইল শান্ত;
সব সন্তাপজাল কাটিল তোমার আশীর্ব্বাদ পেয়ে—
প্রাণ গেল ভরিয়া হরষে আজি প্রাণের প্রাণ॥

খাম্বাজ—তেতালা।

প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—
উঠুক ধ্বনিয়া সুরের লহরী, ছুটুক সে ঢেউ প্রাণের উপরি
সেই ঢেয়েতে বসিয়া সুখেতে,
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
যে সুরে আজ জীবনতন্ত্রী বাজাইলে বন্ধু জীবনযন্ত্রী,
সেই সুরে দাও পরাণ ভরিয়া
আনন্দ ছুটুক দুকূল ছাইয়া—
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
শুনিয়া পরাণ আকুল আমার রইতে নারি ঘরেতে আঁধার
হাওয়ায় খোলা আলোয় খোলা
দিন রাতি যে আপন-ভোলা।
রইতে চাহি বিভোর গানে— তৃপ্তি নাহি পরাণ মানে—
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

(মা) মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে ॥ (ধুয়া)
(মোরা) হিংসা দ্বন্দ্ব গেছি ভুলে,
প্রাণ আমাদের গেছে খুলে,
এসেছি মা পূজা দিতে
ছুটে তাইতে মিলে তোকে।

মান অভিমান ছোটখাটো
ফেলেছিল চোখে কুটো,
এতদিন তাই দেখিনিকো,
(এখন) ভরেছে প্রাণ তোরে দেখে'।
(এবার) পূজায় যেন বুঝতে শিখি—
তুই মা মোদের সবার একই;
ভায়ে ভায়ে যেন ভালবেসে
হাসি আনতে পারি মুখে।

শক্তিময় তোর দুগ্ধ খেয়ে,
চলেছি মা মানুষ হয়ে;
শত বাধায় আর ফিরতে না হয়,
এই-মত বল দে মা বুকে।
ত্রিশ কোটী তোর ছেলে মিলে
অভ্রভেদী মহান্ সুরে,
(তোরে) ডাকবে যবে মা মা বলে,'
সাড়া পড়বে বিশ্বলোকে ॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তোর্ মা রূপে আজ্ ভরেছে ভুবন। (ধুয়া)
(তোর্) জোছনা মেখে আকাশ সারা
হাস্‌ছে দেখ্ মা আপন্‌-হারা;
সেই হাসির্ মা পরশ্ পেয়ে
পাগল্ হয়্ মোর্ পরাণ মন্।
ভুবন্ ভরে আজ্ উঠ্‌ছে যে গান—
সুরের্ পরে সুর্ উঠে যে তান্—
তৃপ্তিতে অতৃপ্ত হয়ে
শোনে গিরি সাগর বন্।
(আমি) হাসি কাঁদি কি যে করি
আকুল হই মা, ভেবেই মরি;
(তোর্) আলোর্ আঁধার অন্ধ করে—
সুখের অশ্রু ভাসায় নয়ন্
(আমার) মিটে যায় মা সকল আশ্
পরাণের মা ঘুচে ত্রিয়াশ্।
(যবে) তোরে দেখি, তোর্ বাণী শুনি—
পড়ে রই তোর্ ধরে চরণ্।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

মন ভজ রে আনন্দ পরম ধন—
জননী—যিনি সন্তাপনাশন।
শম দম ধর চিতে নিশি দিন রে;
স্বজন দারা সুত বন্ধু কিছু না—
শুধু তাঁহারে ধর প্রাণে অনুখন।
সন্তাপিত পরাণ তাঁরে দিয়ে
শীতল কর দেহ মন রে।
হরিপদে বিমুখ অনেক দুখ পায় রে—
কঠিন দণ্ড লভে শিরে অগণিত।
ধরি' তাঁহারি পদ লভ নিতি শুভমতি—
লভ আনন্দ প্রাণে নিশিদিন রে ॥

শততম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

আজ হইতে শতবর্ষ পূর্ব্বে এই ১১ই মাঘের পুণ্য-প্রভাতে রাজা রামমোহন রায়ের যে উদার কল্পনা নব্য ভারতের অভিনব প্রতিষ্ঠানরূপে এই কলিকাতা নগরীর বুকে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ দিকে দিকে তাহারই বিশাল শাখাপ্রশাখা শ্যাম পত্রগুচ্ছে মণ্ডিত হইয়া ভারতের উত্তপ্ত বক্ষকে যুগপৎ ছায়া ও শীতলতা দান করিতেছে। এ কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য—ইহাতে যে মোটেই অত্যুক্তি নাই, ইতিহাস সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে। ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ যে যুগোচিত জাগরণ লক্ষ্য হইতেছে, তাহা যে রাজা রাম-মোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদার কল্পনার অভিব্যক্তি, ইহা আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার ১১ই মাঘের উপদেশে সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশে বা কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র জগতেই যে এ যুগে রাজা রামমোহন রায় মিলন ও মঙ্গলের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহের "ব্রহ্মবাদীর বাণী"তে সুব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অতি সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্তর্জাতিক আন্দোলনের মূলে মহাত্মা রাজা রামমোহনের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। এইসকল কথা ধীরভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই শততম ব্রহ্মোৎসব—ইহা কেবল সংকীর্ণ বঙ্গদেশের কোন সাম্প্রদায়িক উৎসব নহে—ইহা সমগ্র জগতের মিলন ও মঙ্গলের যুগোচিত নব উদ্বোধন-উৎসব। সুপ্রাচীন আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বসিয়া যদি কেহ চিন্তা করেন যে, নবযুগের মিলনগঙ্গার গঙ্গোত্রী এই পুণ্যভূমি, তখন সেই দিব্য অনুভূতির অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া দিবেই। এবারকার উৎসবে এই মিলন ও মঙ্গলের মাহাত্ম্য

এমনি মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল যে ব্রাহ্মসমাজের বিগত শতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় মিলে না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র আদিব্রাহ্মসমাজই প্রথমে এই মিলনসাধনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাকে আহ্বান ও স্বয়ং তথায় যোগদানের পুণ্য প্রচেষ্টা আদিব্রাহ্মসমাজেই প্রথমে জাগ্রত হইয়া উঠে। এবার বিভিন্ন শাখার সহিত সম্মিলিত উপাসনায় এবং উদ্যানসম্মিলনে পরস্পর মেলামেশায় এবং বিভিন্ন শাখার পরস্পরের সহযোগিতায় দীর্ঘ দশাহ-ব্যাপী উৎসব-আয়োজনের মধ্য দিয়া শততম ব্রহ্মোৎসবের বৈশিষ্ট্য নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এবারকার শতবার্ষিক উৎসবে আদিব্রাহ্মসমাজে যুবকশক্তির জাগরণ ভবিষ্যৎ কল্যাণের সূচনা করিয়া নবোৎসাহ ও নবশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। এবারকার ইংরাজীতে ব্রহ্মোপাসনা আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার এবং উহা নব জাগরণ ও নব শক্তিসঞ্চারের সূচনা করিয়াছিল। ঔপনাগরিক শাখাসমাজগুলির সহিত একাত্ম হইয়া উৎসব-আয়োজনের অভিনবত্ব এবার একটী দিব্য প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিল। এবার যেন চতুর্দ্দিক হইতে নবপ্রাণ ও নূতন প্রেরণার বিপুল তরঙ্গ আসিয়া ভারতবাসীর মনোমালিন্যকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে।

এবার মাসের প্রথমদিবস হইতেই উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। ১লা মাঘ বুধবার সন্ধ্যা ৬৷৹ ঘটিকায় বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শততম ব্রহ্মোৎসবে সমাগত উপাসকগণকে উদ্বোধিত করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের জ্বলন্ত 'উদ্বোধন' আমরা পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। কৃষ্ণকুমার বাবুর উপদেশ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই; উহা হস্তগত হইলে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এদিনে সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী D. Mus. (Ind.)। সুবিখ্যাত বাদক শ্রীপিয়ারীলাল দাস মহাশয় পাখোয়াজ বাজাইয়া সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্যকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

গত ৩রা মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬৷৹ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। এদিন বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন আদিব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ। উপদেশের বিষয় ছিল "ব্রাহ্মসমাজের পুরাতনী"। প্রথমে চিন্তামণি বাবু ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-ব্যাপী কর্ম্মের ইতিকথা পাঠ করেন। ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল; এবং তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। অতঃপর স্বাধ্যায়ান্তে সতীশবাবু প্রধানতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের জীবনসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মসমাজের ইতিকাহিনী বিবৃত করেন। এদিনে প্রধানতঃ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুরাতন সঙ্গীত গীত হইয়াছিল।

গত ৫ই মাঘ রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে মাসিক সমাজের অধিবেশনটিকে উৎসব দিবসে পরিণত করিয়া আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করেন। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ উদ্বোধন ও উপদেশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্বাধ্যায় পাঠ করিয়াছিলেন আচার্য্য চিন্তামণি। সভায় সমাগত উপাসকবর্গকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের মুদ্রিত উপদেশ বিতরিত হইয়াছিল।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬৷৹ ঘটিকায় ১নং ডাক্তার রাজেন্দ্র রোডে ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে আহূত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সায়ং উপাসনায় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণপূর্ব্বক উদ্বোধন ও উপাসনান্তে "উৎসবের প্রাণ" বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। উহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল এবং পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী D. Mus. (Ind.) তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া সমাগত উপাসকগণের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

গত ৬ই মাঘ সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব উপলক্ষে ১৫নং কলেজ স্কোয়ার 'আলবার্ট-হলে' একটী সম্মিলিত স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। খ্যাতনামা বহু বক্তা এই সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুপবিত্র স্মৃতিকথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এদিন আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'স্বাধীনতা-প্রীতি' বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল এবং তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইল।

গত ৮ই মাঘ (১১ই মাঘের পূর্ব্ববর্ত্তী) বুধবারে এবারে একটু নূতন ধরণের আয়োজন হইয়াছিল। সুসংবাদ সন্দেহ নাই, কয়েকজন যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সাহায্য ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এদিন আমরা তাঁহাদেরই কয়েকজনের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলাম। বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনান্তে বেদীর নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন প্রভাব" বিষয়ে একটী সুন্দর নিবন্ধ পাঠ করিয়া সমাগত উপাসকবর্গকে শততম ব্রহ্মোৎসবে যথার্থই উদ্বোধিত করেন। ব্রহ্মবাদীর বাণীগুলির সুনিপুণ সন্নিবেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বাধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। তাই ঠিক স্বাধ্যায়ের পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল মহাশয় বেদীর নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া "ব্রহ্মবাদীর বাণী" বিষয়ে একটী সুচিন্তিত নিবন্ধ পাঠ করেন। স্বাধ্যায়ান্তে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ মহাশয় "ব্রাহ্মসমাজ ও শাস্ত্র" বিষয়ে তাঁহার

সুললিত কবিত্বময় ভাষায় বহু পুরাতন তথ্যপূর্ণ একটী নিবন্ধ পাঠ করিয়া সমাগত উপাসকবর্গের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের এই তিনটী যুবকবন্ধুর সাহায্য ও সহযোগিতা আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছি। আদিব্রাহ্মসমাজের তপস্যাকঠোর সুবিশুদ্ধ আদর্শ দিন দিন ইঁহাদের অন্তরকে নিষ্ঠাশীল করিয়া তুলুক। ইঁহাদের প্রবন্ধ-তিনটী আগামী ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

গত ৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট-হলে একটী সম্মিলিত উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এদিন সভায় আশ্চর্য্যরূপ জনসমাগম হইয়াছিল। অতবড় সভা-গৃহের উপরে ও নীচে আর তিলধারণেরও স্থান ছিল না। আচার্য্য কৃষ্ণকুমারের উদ্বোধন ও আচার্য্য কামাখ্যানাথের আরাধনান্তে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ "মিলনোৎসবের" উপযুক্ত একটী হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

গত ১০ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্ম-সমাজগৃহে সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস পণ্ডিত শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের সহিত বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক ইংরাজীতে উদ্বোধন ও উপাসনান্তে "Message to Young India" নামে একটী সুচিন্তিত অগ্নিময় উপদেশ দান করেন। ইহা মুদ্রিত হইয়া সভায় সমাগত উপাসকগণকে এক এক খণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় এই উপদেশ ও উদ্বোধন উভয়ই প্রকাশিত হইল।

এই কয়দিন ধরিয়া প্রতি উপাসনায় উপদেশে ও উদ্বোধনে যাহার আগমনী গীতি ঝঙ্কৃত হইতেছিল, অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত ১১ই মাঘের পুণ্যপ্রভাত নামিয়া আসিল। শত বৎসরের সুপ্রাচীন উপাসনালয় আজ উৎসবোচিত নববেশে সুসজ্জিত হইয়াছে। পত্রে পুষ্পে সানাইয়ের প্রভাতী রাগিণীতে ও ধূপ-ধুনার পবিত্র সৌরভে উপাসনামন্দির একটী অভিনব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। অবশেষে বেলা ৮ ঘটিকায় উপাসনা-গৃহটী ধীরে ধীরে উপাসকগণে পূর্ণ হইয়া আসিল। শঙ্খ-ঘণ্টার সুমঙ্গল নিনাদে উপাসনার শান্ত আহ্বান দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুগম্ভীর স্বরে সমবেত কণ্ঠে বেদগান উত্থিত হইল—"অসতোমা সদ্গময়" 'অসৎ হতে দেব তুমি সত্যে লয়ে যাও মোরে' মাতৃচরণে বাণী দেবীর এই নব-উপহৃত পুষ্পাঞ্জলি সমবেত উপাসকগণের অন্তরের সঞ্চিত ভক্তি-প্রীতিকে প্রগাঢ় ও প্রস্ফুট করিয়া তুলিল। বেদগানান্তে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণ করিলে সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ ভৈরবী রাগিণীতে গান ধরিলেন 'প্রাণ সঁপিনু তোমার পদে অন্তর্য্যামী'। অতঃপর বাণী দেবীর নেতৃত্বে কয়েকটি বালিকাকণ্ঠে গান্ধারী রাগিণীতে "মোর প্রাণ-মন ভরি" পূজিব তোমায়—এস সজ্জিত সুন্দর মনোমন্দিরে হে" সঙ্গীতান্তে ক্ষিতীন্দ্রনাথ সমবেত উপাসকগণকে সুগম্ভীর কণ্ঠে উদ্বোধিত করিলেন। এই উদ্বোধন-বাণীর প্রতি পংক্তি অগ্নিশিখার ন্যায় অন্তরকে স্পর্শ করে। আমরা এই ১১ই মাঘের উদ্বোধন পত্রিকায় বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। অতঃপর মধুর রামকেলী রাগিণীতে গীত হইল—'রক্তরবি উঠল গগন ভরে'। 'তাঁরি দেখ ভুবনে মোহন ভাব মহিমা বিচিত্র সবে হে' গানটী আশাইয়া রাগিণীতে গীত হইবার পর আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ সুগম্ভীর কণ্ঠে স্বাধ্যায় আরম্ভ করিলেন—'যোদেবোহগ্নৌ যোঽপ্সু' স্বাধ্যায়ান্তে সমগ্র উপাসকগণের অন্তরের অনুভূতি যেন বাণী দেবীর কণ্ঠে সঙ্গীতের আকারে মূর্ত্ত হইয়া ভৈরবীর সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—'কনকভানু গগনভালে রাঙ্গাইছে জ্যোতি তাঁরি প্রকাশি'। অতঃপর সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথের সুগম্ভীর কণ্ঠে 'হো ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর' স্তুতিগীতটী ভৈরবরাগে গীত হইবার পর আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী হইতে জলদগম্ভীর কণ্ঠে "ব্রাহ্মসমাজের দান"বিষয়ে তাঁহার প্রাণময়ী ভাষায় বহু তথ্যপূর্ণ একটী সুচিন্তিত উপদেশ দান করেন। ব্রাহ্মসমাজের বিচিত্র ও বিপুল জীবনকাহিনীর সহিত ইহা আদ্যন্ত এমনই ভাবে বিজড়িত যে, পাঠকালে শ্রোতৃবর্গের অন্তরে চলচ্চিত্রের ন্যায় তড়িতগতিতে সেই শতবর্ষব্যাপী অতীত ইতিহাস জাগ্রত হইয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজ যে নির্বিচারে হিন্দুসমাজের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে, বিশাল হিন্দু-সমাজের আজিকার এই জাগরণ যে মূলে ব্রাহ্মসমাজেরই দান, ক্ষিতীন্দ্রনাথের এই উপদেশে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। আমরা তত্ত্ববোধিনীর এই মাঘোৎসব সংখ্যায় উহা প্রকাশ করিলাম এবং সভাস্থলেও উহা পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে তিনটী সঙ্গীত গীত হয়; তাহার মধ্যে বাণী দেবীর কণ্ঠে 'বাঁশরী মরমে আজি বাজিছে তোমারি' গানটী এবং রামপ্রসাদী সুরে সমবেতকণ্ঠে গীত সর্ব্বশেষবর্ত্তী '(মা) মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে' সকলের হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল। এদিন প্যারীবাবুর পাখোয়াজ ও গোবিন্দবাবুর এস্রাজ সঙ্গীতগুলিকে একটী অভিনব-শ্রী দান করিয়াছিল। উৎসবান্তে ক্ষিতীন্দ্রভবনে একটী ক্ষুদ্র প্রীতিভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

১২ই মাঘ রবিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজে সায়ং উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেহালা-ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মসমাজের কালী-ঘাট বলিতেন। সহরের কৃত্রিম আবেষ্টনীর অঙ্কে নিত্য উৎপীড়িত নরনারীর পক্ষে বেহালার এই পল্লীসুলভ শ্যামলতা ও নীরবতা সত্যই লোভনীয়। কলিকাতার এত নিকটে উপাসনার অনুকূল এই নির্জ্জন ব্রহ্মমন্দিরটীর যাহাতে যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার হয়, সে বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই মনোযোগ বাঞ্ছনীয়। উক্ত দিবস শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থকে সঙ্গে লইয়া বেদী গ্রহণ করেন। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্রের উদ্বোধনান্তে সমবেতকণ্ঠে স্বাধ্যায় পঠিত হইলে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ একটী সময়োপযোগী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন সুকবি শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল এবং শ্রীভূদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন স্থানীয়

ভদ্রলোক। আমাদের মুদ্রিত কার্য্যতালিকায় উল্লিখিত না হইলেও চিন্তামণিবাবুর পুত্রগণের উৎসাহে ও আয়োজনে এইদিন প্রাতঃকাল ৭॥০ ঘটিকায় বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন এম-এ মহাশয় ভক্তবাণী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তরুণবয়স্ক যুবক শ্রীহিমাংশুশেখর দত্ত অধ্যাপক মহাশয়ের ব্যাখ্যাত বাণীগুলিকে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করিয়া সমাগত উপাসকগণকে বড়ই আনন্দদান করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই মাঘ সোমবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডে 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে' সায়ং উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকে সঙ্গে লইয়া বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমাজের সম্পাদক শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার প্রেরিত সংক্ষিপ্ত 'নিবেদন' উদ্বোধনের পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল এবং মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। উহা আমরা পত্রিকার মাঘোৎসব-সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ সমবেত উপাসকবর্গকে উদ্বোধিত করিয়া উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন, বেহালা-ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সম্পাদক শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন যুবক বন্ধু।

গত ১৯শে মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় বেলগেছিয়ার উদ্যানবাটিকায় ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয়ের একটী সম্মিলিত 'উদ্যানসম্মিলনী' হইয়া গিয়াছে। এরূপ অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। শততম ব্রহ্মোৎসবের আনন্দকল্লোল যে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাগুলিকে কিরূপ উদ্বেলিত ও আন্দোলিত করিয়াছে, তাহা এদিন অতি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল। পরস্পরের আলাপ-আলোচনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার আর অন্ত ছিল না। একটী সুবৃহৎ তেঁতুল গাছের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী মাননীয়া শ্রীসুচারু দেবী বেদীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গাদি চলিয়াছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয়ের আবালবৃদ্ধবনিতার সম্মিলিত প্রীতিভোজন এক অভূতপূর্ব্ব ও অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এবার নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মৃজাপুর-ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটী প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শততম ব্রহ্মোৎসবকে একটী অভিনব-শ্রী দান করিয়াছিলেন। গত ১১ই মাঘের পুণ্যতম দিবসে ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল এবং মাঘের চতুর্ব্বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ দিবস ধরিয়া ইহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এখানে আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে একটী পুস্তকালয় খোলা হইয়াছিল।

গ্রন্থপরিচয়।

চুলের গাছ—শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস এম্ এস্ সি ২৪।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

অমর গল্প—শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায় প্রণীত। প্রকাশক—ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

এই দুই সচিত্র পুস্তকে হিমাংশু বাবু বাংলার শিশুদের জন্য দুইটি প্রসিদ্ধ বিদেশী গ্রন্থের রস পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচন সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকদুইটি যাহাদের জন্য লিখিত, তাহাদের আনন্দ দিবে সন্দেহ নাই। দুইটি পুস্তকেই কতকগুলি সুন্দর চিত্র আছে।

ভাগবত ধর্ম্ম—শ্রীঅবনীমোহন বটব্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনুবাদিত। মূল্য আট আনা। ঢাকা, ডাকঘর ফরিদাবাদ, গণ্ডারিয়া হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শাস্ত্রসমুদ্র হইতে সংগৃহীত কতিপয় রত্নরাজি দ্বারা গ্রন্থকার এই মনোহর হার গ্রথিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে সুনিপুণ ডুবুরী, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রতিপত্রে দেদীপ্যমান। আমরা আশা করি সকলেই এই রত্নহার কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

দীপ ও ধূপ।—'আলো ও ছায়া' প্রণেত্রী-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় বি-এ, ৪২।এ হাজরা রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। তখন জাতীয় কবি হেমচন্দ্র উহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি"। তাহার পর 'আলো ও ছায়া'র কবি বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবার ফলে সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহু অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যকে অপূর্ব্ব ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আজ তাঁহার নাম শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত, আজ গ্রন্থনিয়োগে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইবার কারণ ছিল না।

বোধ হয় ল্যাণ্ডর বলিয়াছেন, অখিল জনপ্রবাহ দেখিতে যত গভীর মনে হয়, স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী দেখিতে তত গভীর মনে হয় না; সরল ও প্রাঞ্জল রচনা স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতীর ন্যায়। কবি কামিনী রায়ের রচনা পড়িলে এই কথাই বারম্বার মনে উদিত হয়। আজি-কালিকার প্রহেলিকাময়ী গীতিকবিতার সহিত এই কবিতাগুলির কত পার্থক্য! এই সরল কবিতাগুলির মধ্যে কবিহৃদয়ের কি গভীর আন্তরিকতা, কি নিবিড় সহৃদয়তা, 'সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলে'র প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! তাঁহার ভাষার অপূর্ব্ব সংযম, রচনার শান্ত মাধুর্য্য, প্রতিভার অলোকসামান্য দীপ্তি প্রতি ছত্রে কবির অপূর্ব্ব সাধনার পরিচয় দিতেছে! কবির এই গ্রন্থ পরিণত বয়সের রচনা হইলেও উহাতে সর্ব্বত্র আধুনিকতার ছাপ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তরুণ বয়সে কবি লিখিয়াছিলেন,

"আমি যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর,
কালে না করিবে জয় জীবন-বসন্ত মোর;"—

পুনশ্চ—

"সে কেমন হবে, আমি অবহেলি বর্ত্তমান,
স্বপন-সন্তান এক অতীত করিব ধ্যান,
অন্ধ চক্ষুঃ তপ্তধারা বরষিবে অনুদিন,
সম্মুখে আলোকরাজ্য হেরিবে না দৃষ্টিহীন?"

পরিণতবয়সের রচনা পড়িয়া মনে হইতেছে কবির তপস্যা সফল হইয়াছে। তাঁহার দেশপ্রেমবিষয়িণী কবিতাগুলিতে বাঙ্গলার আধুনিক প্রাণের অপূর্ব্ব সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মতে গ্রন্থসন্নিবিষ্ট প্রায় একশত নানাবিষয়িণী কবিতার মধ্যে দেশপ্রেমোদ্দীপনী কবিতাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফুটিয়াছে। ইচ্ছা হয়, কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিই, কিন্তু এস্থলে তাহার স্থান নাই। "ওরে তোরা ভবিষ্যের দল" শীর্ষক কবিতা হইতে শেষাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল:—

"দৃপ্ত তোদের পদভরে কাঁপুক রসাতল,
অতীত যা', পতিত যা', নাই যাহাতে বল,
বর্ত্তমান সে প্রাণের বেগে করুক টলমল,
এগিয়ে ধর ভবিষ্যতের আলোক উজ্জ্বল,
ওরে তোরা পথ দেখাবার দল।
মৃত্যুবরণ করি' যারা মৃত্যুরে জয় করে,
কাঁটার মুকুট হ'তে যাদের নিত্য আলো ঝরে,
তাদের মত ভাষা তোদের, তাদের মত হাস,
তাদের জয়-মাল্য-গন্ধে শৃঙ্খল সুবাস।
থাক্ না হাতে হাতকড়া, থাক্না বেড়ী পায়ে,
যাক্না নিয়ে কারাগারে, দিক্না ধূলা গায়ে,
পিছে যারা আসছে তারা উদ্দেশে নমিয়া,
বলবে—ধন্য জন্মভূমি এদের জনম দিয়া।"

কবি বহুস্থানে জাতির জীবন-সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন, প্রত্যেক পাঠক এই কবিতাগুলিতে চিন্তার পর্য্যাপ্ত উপাদান পাইবেন। "নবজাগরণ" শীর্ষক কবিতার উপসংহারাংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য:—

* * * তবে এইবার
দাঁড়াও মা, আপনার পায়ে করি ভর,
চেয়ে দেখ, দেখ চেয়ে পূর্ব্ব সিন্ধু পার
উদিছে নবীন ভানু, অপূর্ব্ব ভাস্বর।
মুক্ত কণ্ঠে, যুক্ত করে, অন্তর ব্যাকুল,
'পিতা নোঽসি' বলে আজ ফিরে গাও গান,
যাবে ভয়, হবে ক্ষয় অতীতের ভুল,
জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে দৈন্য হবে অবসান।
বুঝে লও, হে প্রাচীনা, কোন্ উৎস হতে
অনন্ত জীবনধারা যৌবন অক্ষয়
বহি আসে, অবগাহি কোন্ মহাস্রোতে
সমবর্ণ সর্ব্বনর দ্বিজ শূদ্র নয়।
জীবনের ইহকূলে যাহা করণীয়
কর আজ, থাকে যাহা থাক্ পরপার;
মান দাও মানবেরে—সে যে বরণীয়,
মনে তার দাও জ্ঞান, অন্ন মুখে তার।

উপসংহারে, আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গবাণীর মন্দিরে আজ কবি যে 'দীপ ও ধূপ' লইয়া আসিয়াছেন, সেই দীপের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বহুযুগ ব্যাপিয়া অন্ধকারে পথহারা পথিককে 'সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের' পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, এবং সেই ধূপের প্রীতিকর প্রাণামোদকারী সুবাস আবর্জ্জনার পূতিগন্ধে দূষিত বাণীমন্দিরকে স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত করিয়া রাখিবে।

গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রচ্ছদপটটী শিল্পী চারু রায়ের প্রতিভার উপযুক্ত হইয়াছে।*

গার্হস্থ্যসংবাদ।

বিবাহ।—গত ৫ই মাঘ রবিবার রাত্রি ৮৷৷০ ঘটকায় শুভ লগ্নে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-ভবনে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমেধা দেবীর সহিত বেরিলীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথের পুত্র পণ্ডিত শ্রীমান্ রাজনাথের শুভ-বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

* আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থরচনার জন্য কবি কামিনী রায়কে 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। এ সম্মান আরও পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রদান করা উচিত ছিল।

ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। বিবাহ সভায় বহু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল। ভগবান এই নব দম্পতিকে নিত্য প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দীক্ষাগ্রহণ।—গত ৪ঠা মাঘ শনিবার সায়ংকালে বেরিলী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথের পুত্র পণ্ডিত শ্রীরাজনাথের দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীক্ষিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ভগবান ইহাঁকে নিত্য জ্ঞান ও ভক্তির পথে অগ্রসর করিয়া ইহাঁর ধর্ম্মবৃদ্ধির সহায় হউন।

নামকরণ।—গত ১৭ই মাঘ শুক্রবার সায়ংকালে ৩৯ নং অ্যান্টনি বাগান লেনে স্বর্গীয় ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের নবকুমারের নামকরণ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক উপাসনা ও উপদেশান্তে নবকুমারের শ্রীমান গীতীন্দ্রকুমার নামকরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া সমাগত উপাসকগণের অন্তঃকরণে আনন্দবিধান করেন। উপাসনাসভায় বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে একটী প্রীতিভোজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভগবান এই নবকুমারকে আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথে নিত্য বিবর্দ্ধিত করুন।

শোকসংবাদ।

৺শিতিকণ্ঠ মল্লিক—বিগত ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে'র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় ২নং চক্রবেড়িয়া লেনে তাঁহার ভবানীপুরের স্বকীয় বাসভবনে প্রায় ৮৭ বৎসর বয়সে বার্দ্ধক্য জনিত পীড়ায় কিছুদিন ভুগিয়া অবশেষে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে'র যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আনুমানিক ইং ১৮৬১ সালে তাঁহার পঠদ্দশায় ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহাদের উভয়ের অন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। তদবধি আমৃত্যু শিতিকণ্ঠ বাবুর ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র ছিলেন এবং পরে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যৌবনে তিনি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি মহর্ষিদেবকে স্বীয় ধর্ম্মগুরু বলিয়া যেমন ভক্তি করিতেন, তেমনই ব্রহ্মানন্দকেও প্রেম ও ভক্তিসাধনার পথপ্রদর্শকরূপে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি মহর্ষিদেবের বিশুদ্ধ ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া নিজেকে কখনই বিরাট হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ মনে করিতেন না। ওকালতি পাশ করিয়া কয়েক বৎসর পরে তিনি মুনসেফ নিযুক্ত হন। যোগ্যতার সহিত বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে তিনি অস্থায়ী ভাবে সবজজের পদে উন্নীত হন। কার্য্যোপলক্ষে তিনি যে যে স্থানে বদলী হইয়াছেন, সর্ব্বত্রই তিনি স্থানীয় ব্রাহ্ম ও উদারপন্থী হিন্দুগণকে একত্র করিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ব্রহ্মোৎসবের ব্যবস্থা করিতেন। তিনি ইং ১৮৯৯ সালে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তদবধি আমৃত্যু তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সেবায় তাঁহার সকল চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি প্রতি সোমবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করিয়া গিয়াছেন। উপাসনায় এরূপ নিষ্ঠা অধুনা ব্রাহ্মসমাজে একান্ত বিরল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইহাঁর অনুরাগ এরূপ সুতীব্র ছিল এবং ইহার সেবায় তিনি এত আনন্দ পাইতেন যে, এই বার্দ্ধক্যে সময় সময় রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও সমাজের নিয়মিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না। এবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন হইলে তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া উৎসবের জন্য তাঁহার 'নিবেদন' লিখিয়া উহা ছাপাইবার নিমিত্ত চিন্তামণি বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। রোগে দুর্ব্বলতাবশতঃ উৎসবে যোগ দিতে পারিবেন না জানিয়া তিনি উহাতে লিপিবদ্ধ করেন যে, "যদিও আমি সশরীরে উৎসবে যোগ দিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু আমার অন্তর উৎসবে যোগদান করিবে"। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার থাকিয়া উহার অর্থসমস্যা বিদূরিত করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য স্বর্গগত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহবাসে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আস্বাদ পান; এজন্য কেবল তাঁহার উপর নহে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উপরেও আজীবন তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি এই বার্দ্ধক্যেও বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে নিয়মিত যোগদান করিতেন এবং দ্বিপ্রহরে তথায় সকলের সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি করিয়া আপন অন্তরের উদারতা ও প্রীতি সুব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও ইনি একান্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 'দুই ভাই' নামে একটী ছোট গল্প লিখিয়া ইনি পারিবারিক জীবনে সদ্ভাববিকাশের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর সুদীর্ঘ জীবনে নানা উৎসবে ও উপাসনায় ইনি যেসব সুচিন্তিত নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেগুলিকে একত্র করিয়া 'সৎপ্রসঙ্গ' নামে একটী গ্রন্থপ্রকাশে ইনি বাঙ্গলার ধর্ম্মসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। এ যুগে এরূপ মহাপ্রাণ ও সরলচেতা ব্যক্তি সত্যই দুর্ল্লভ। মৃত্যুর দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি আদিব্রাহ্মসমাজে ২০০৲ এবং বেহালা ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲ টাকা দান করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুকে অকাল-মৃত্যু বলা না গেলেও এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ উদারহৃদয় ব্যক্তিকে হারাইয়া কেবল আমরা নহি, ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসমাজ-হিতৈষী মাত্রই ব্যথিত হইবেন সন্দেহ নাই। ইহাঁর সুযোগ্য পুত্র রায় শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক বাহাদুর এবং অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুগণের এই প্রগাঢ় শোকে আমরা গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁদের অন্তরে সান্ত্বনা এবং লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

হিতৈষণাগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত।

বন্ধু আমার—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর. হিতৈষণা-গ্রন্থাবলীর ২৮ সংখ্যক গ্রন্থ; আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত, দাম একটাকা মাত্র।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ শ্রীভগবানের করালমূর্ত্তি উপাসনা করেন না, বিশ্বপাতা মনে করিয়া তাঁহাকে তিনি ভয়ের চোখে দেখেন না—তিনি তাঁহাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; এবং বন্ধু বলিয়া জানিয়া বুঝিয়া বন্ধুর মতোই সরলভাবে তিনি তাঁহার প্রাণের দেবতাকে প্রাণের বেদনা নিবেদন করিয়াছেন। সাধকরা এমি একটা অবস্থা পান বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। ক্ষিতীন্দ্র-নাথ বলিতেছেন—“ধ্যানস্থ আসনে বন্ধুর সহিত বিচরণ-কালে দিনে দিনে যে সকল ভাব অন্তরে সমুদিত হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।”

—নবশক্তি, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

The book is a sort of prose poem embodying the deep spiritual experiences of the author over a period of two eventful years of his life, during which he had had a spell of difficulties. Kshitindra Nath is of course no novice in the field of literature. He has already established a fine reputation for himself by his other literary works, especially on religious subjects. The present volume also fully sustains his previous reputation and gives us an excellent and very intimate insight into the delights and depressions of his profound and soulful spiritual experiences with the Divine Personality whom he calls his “Friend” in the plenitude of his inspired spiritual enthusiasm! —Liberty, October 6th 1929.

খেয়াল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। পকেট সাইজ; ছাপা, বাঁধাই, কাগজ উত্তম। অনেকগুলি উত্তম ফটোচিত্র-সম্বলিত। কলিকাতা হাই-কোর্টের জজ স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

“খেয়ালের” প্রধান বিষয় নানাস্থানে এবং নানা সময়ে গ্রন্থকারের ভ্রমণ এবং পরিদর্শন বিষয়ক বৃত্তান্ত—যথা, (১) সাহিত্যিকের উড়োযাত্রা; (২) আমার সন্ন্যাসযাত্রা; (৩) রাঁচিতে দিন-কয়েক এবং (৪) রামপুর যাত্রা। যে যে স্থানেই গ্রন্থকার ভ্রমণে গিয়াছিলেন,—সেই সেই স্থানেরই বহুবিধ বিবরণ ইনি এই ‘খেয়ালে’ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহার অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্য-সংগ্রহ-শক্তির প্রচুর প্রমাণ এই পুস্তকে পরিস্ফুট। প্রসঙ্গতঃ কলিকাতার সে বৎসরের দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং রেলের ক্রু-ম্যান প্রভৃতি আরও অনেক কথা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কল-কারখানার পরিণামচিন্তাও ইহাতে এক স্থানে আছে। ৬৩ পৃষ্ঠায় লক্ষ লক্ষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর চির-প্রচলিত শ্যামাপূজা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে,—“শ্যামাপূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যিনি যতই বিস্তৃতভাবে করুন না কেন, অনার্য্যদিগের অনুষ্ঠিত শ্যামাপূজা দেখিলে সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি হইবে বলিয়া মনে হয়, শ্যামা প্রকৃতই অনার্য্যদের দেবতা; সামাজিক প্রয়োজন হওয়ায় কালক্রমে আর্য্যেরা তাহাকে নিজেদের পূজিত দেবতাদিগের অন্যতর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্যামাপূজা কোন বর্দ্ধিষ্ণু (?) ও সভ্যতার সোপানে সমুন্নত পল্লীর পক্ষে উপযোগী বা শোভন বলিয়া মনে হয় না।” ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে হিন্দুর পরমারাধ্য শ্যামাপূজা লইয়া এই অনধিকার চর্চ্চা কখনই উচিত নহে।

—বঙ্গবাসী, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৬।

এই পুস্তকখানি কয়েটি ভ্রমণবৃত্তান্তের সমষ্টি। গন্তব্য স্থানগুলি সাধারণের পরিচিত হইলেও এই ভ্রমণবৃত্তান্তের ব্যপদেশে অধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বহু-বিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে; অথচ এতই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক যে পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না। রচনা সহজ ও সরল, শব্দচাতুর্য্যে বা বর্ণনাবাহুল্যে কোথাও নীরস নয়। এক স্থানে একটু ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল, অজন্তার গুহাশ্রেণী নিজাম-রাজ্যে; উহা বোম্বের এপোলো বন্দরের সম্মুখে নহে। ঐ অজন্তার স্থানে ‘এলিফেণ্টার’ হইবে বলিয়া মনে হয়।

—সুবর্ণবণিক-সমাচার, পৌষ, ১৩৩৬।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা ভাবিয়া চিন্তিয়া না বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে বলিলেও তার প্রত্যেক বাক্যটীই শুনিবার মত হইয়া দাঁড়ায়। গ্রন্থকার তাঁহার আত্ম-কাহিনী খেয়ালের মতই লিখিয়াছেন। কখন ঘরে বসিয়া ভূতের ভয়ে অভিভূত হওয়া, কখন সন্ন্যাসী হইয়া দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ—খোলা প্রাণে সব কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। খোলা প্রাণে লেখা বলিয়াই ইহার একটি স্বতন্ত্র মূল্য দাঁড়াইয়াছে। ১৬+২৬৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি একের পর আর কেবল পড়িতেই ইচ্ছা করে। খুটিনাটি বিষয়াবলীর ভিতর দিয়া গ্রন্থকার বহু মূল্যবান রত্নে পুস্তকখানি গ্রথিত করিয়াছেন।

—মাতৃমন্দির, আশ্বিন ১৩৩৬।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৫০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—৫৫, আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

ভগবান মাতৃত্বে নারীপ্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং এই মাতৃত্বের সুপ্রকাশেই নারীত্ব। এই নারীত্বের সম্পূর্ণতার জন্য নারীদিগের শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের নারীশিক্ষার উৎকর্ষ গ্রন্থকার বহু উদাহরণ এবং শাস্ত্রীয় শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার নারীশিক্ষার পাশ্চাত্য আদর্শ আদৌ সমর্থন করেন না। অন্ধভাবে পরানুকরণে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণালীমাত্রই যে পরিত্যাজ্য একথা মানিয়া লওয়া যায় কি? এ যুগে অবরোধপ্রথা ও প্রচলিত সংস্কারের সমর্থন কেহ সমর্থন করিবে কি? যাহা হউক, সামান্য দুইএকটি বিষয়ে মতান্তর থাকলেও গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞান, পবিত্র চিন্তাধারা, জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম প্রভৃতির জন্য পূজনীয় গ্রন্থকারকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠক-সমাজে ইহার সমাদর সূচিত করিতেছে। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলাকে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। —বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ, ১৩৩৩।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১৩ই ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৯ | ১৮৫১ শক ফাল্গুন

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

৫ই মাঘে উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে আমরা সকলে একহৃদয়ে বিশ্বমাতার চরণ বন্দনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি, ইহাতে আমাদের কত-না আনন্দ হইতেছে। এই উপাসকমণ্ডলীকে আমি আর উদ্বোধিত করিব কি—বেশী আর জাগাইয়া তুলিব কি? উৎসবের বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই তো সেই বিশ্বজননী আমাদের সকলকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। বোধনের বাণী আমাদের কানে শুনাইয়া তিনিই তো আমাদের প্রাণে জাগরণের একটা সাড়া আনিয়া দিয়াছেন। আমি আর নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিব কি? ভক্তি শ্রদ্ধা আজ আমাদের হৃদয়ে স্বভাবতই অজস্রধারে নামিয়া আসিতেছে, তাই আজ আমরা আপনারাই বিশ্বমাতার পূজার জন্য এখানে আসিয়াছি।

যিনি বিশ্বপিতা অখিলমাতা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। যে ভক্তিশ্রদ্ধার ভাগীরথী আমাদের প্রাণে আজ নামিয়া আসিয়াছে, সেই ভক্তিশ্রদ্ধার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতার চরণ বন্দনা করিতে হইবে, তাঁহার পূজা করিতে হইবে। তাঁহাকে এখনই এখানেই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ করিব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, তিনি ঈশ্বরকে কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, কেবলই ঈশ্বর ঈশ্বর করেন? তাহার উত্তরে তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, সম্মুখের দেওয়াল অপেক্ষাও তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন। বাস্তবিক, প্রত্যেক সাধকেরই এই কথা। তাঁহারা যে বলেন যে, সাধনা করিলে ভগবানকে করতলন্যস্ত আমলকের মতো প্রত্যক্ষ করা যায়, ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই নাই। যে দেশের শত সহস্র লোক চকিতের জন্যও তাঁহার দেখা পাইলে পাগল হইয়া উঠে, পদতলস্থ ধূলিকণার মত সমস্ত বিষয়বিভব আহ্লাদের সহিত পরিত্যাগ করিতে পারে; যে দেশের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার চরম লক্ষ্যই হইল তাঁহাকে লাভ করা, সে দেশের লোককে এ কথা বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি ঐ সাধনায় সিদ্ধ হইব বলিয়া, ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিবার সাধনায় সিদ্ধ হইব বলিয়া। ঐ যে শতসহস্র বর্ষের প্রাচীন সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি হিমালয়ের উন্নত শিখরে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্ববাসীর নাস্তিকতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং—আমি সেই পুরুষ মহানকে জানিয়াছি, আমাদেরও প্রত্যেককে সেই প্রকার নাস্তিকতা, মূর্ত্তিপূজা, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু ভগবানকে আমাদের চক্ষের অন্তরালে রাখিতে উদ্যত হয়, সকলেরই সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়া সেই অমিত-তেজা ঋষির সহিত একপ্রাণে বলিতে হইবে—আমি তাঁহাকে জানি-

য়াছি, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেবল সুখসম্পদ সম্ভোগের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে এক একটা উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভগবানের কৃপার কথা মুখে বলিলে চলিবে না; সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আমোদ আহ্লাদের মধ্যে এবং কশাঘাতের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, সকল অবস্থাতে, প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, সত্য সত্য তাঁহাকে জাগ্রতমূর্ত্তিতে দেখিতে হইবে, তাঁহার মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। ভারতবাসী সিদ্ধিকামী এই ভাবেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসকেও হংসমন্ত্রের জপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিলেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রাচীন ঋষিদিগের, ভারতের অগণিত সাধক ও সাধু পুরুষের অমূল্য সাধনাসম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যত মূলধন পাইয়াছি, এত মূলধন অন্য কোন দেশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই মূলধনকে অবহেলা না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের প্রত্যেকের সেই মূলধন বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায় হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এই কার্য্যে বিশেষ সহায় জানি বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এত প্রিয় এবং এই মাঘ মাসে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মাঘোৎসব আমাদের এত প্রিয়।

বর্ত্তমান যুগের একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে; এখন আমাদের আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না। এমন সুন্দর অবসর হেলায় হারাইলে চলিবে না। এক শতাব্দী পরেও আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। একদিকে আমাদের প্রত্যেকের গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সযত্নে পালন করিতে হইবে; আমাদের আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে জনসাধারণের সম্মুখে জাগাইয়া রাখিতে হইবে; অপরদিকে, ব্রাহ্মসমাজে, ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর মধ্যে ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে—যেন ব্রাহ্মসমাজ ভক্তিশ্রদ্ধার তড়িতাধার হইয়া উঠে—যথাসময়ে উপযুক্ত ভক্তজনের হৃদয়তন্ত্রী যখনই তাহা স্পর্শ করিবে, তখনই তাহা যেন জ্বলিয়া চারিদিকে চারিপার্শ্ব অগ্নিময় করিয়া তুলিবার শক্তিসামর্থ্য ধারণ করে।

আজিকার এই উৎসবের প্রারম্ভভাগে আমরা যেন সকলে মিলিত হইয়া আমাদের মনপ্রাণ বিশ্বজননীর পূজার উপযুক্ত করিয়া বিশ্বের আরতির সঙ্গে আমাদেরও আরতি যোগ দিয়া উৎসবকে সত্যসত্যই সার্থক করি। বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বরকে, যেন এখনই এখানেই প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদেরও প্রাণে ঐ আশ্চর্য্য অভয়বাণী শুনি এবং সকলকে শুনাইয়া দেশবিদেশকে জাগাইয়া তুলি যে—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং—সেই তিমিরাতীত মহান-পুরুষকে জানিয়াছি। বিশ্বমাতা আত্মার আত্মা মঙ্গলময় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তোমরাও নির্ভয়ে অগ্রসর হও এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হও।*

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাব।

(শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়)

আজ শতবর্ষ হইতে চলিল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নবোদ্যমে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের আজ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন হইয়াছে যে, এই ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে আমরা কি কি পাইয়াছি; এবং এই ধর্ম্মের প্রভাব আমাদের উপর কতটুকু বিস্তারলাভ করিতে পারিয়াছে। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর পাইতে হইলে আমাদের জানিতে হইবে যে, তখন আমাদের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং এখনই বা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে আস্থাবান তাঁহারা বলিবেন যে এত বিশ্লেষণ-বিবেচনারই বা প্রয়োজন কি? তাঁহারা গীতার "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিবেন যে সে সময়ে একটি নব ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছিল। আস্থাবানদের সহিত এবিষয়ে আমাদেরও কোনও মতভেদ নাই; কিন্তু যে জিনিষ আমাদের জীবন-মরণের সঙ্গী তাহাকে সম্যকরূপে না জানিলে তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা দেওয়াও যায় না এবং প্রাণপণে গ্রহণও করা যায় না।

যখন এই ধর্ম্ম মহাত্মা রাজা রামমোহন প্রথম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন একদিকে ইউরোপের চমকপ্রদ আচার-ব্যবহার, বিলাসিতা ও সহজ-সরল উপাসনাপদ্ধতি আমাদিগকে ঐদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল; অন্যদিকে আমাদের সমাজপতিদের অতি কঠোর শাস্তি ও গুরু-পুরোহিতদের প্রাধান্য ও অত্যাচার, জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আমাদের দেশীয় ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। যাঁহাদের চেষ্টা ও যত্ন দেশকে বহুভাবে উন্নত করিতে পারিত, তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণান্তর দেশীয় সমস্ত নিয়মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে বিদেশীদের সাহায্য করিয়া আমাদের নিয়মগুলি জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলেন। শিক্ষিত ও শক্তিমান সম্প্রদায় সমাজ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ায় অবশিষ্ট কতিপয় স্বার্থান্ধ গুরু ও পুরোহিত

* গত ৩ই মাঘ রবিবার আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিবৃত।

শ্রেণীর লোকেরা শাস্ত্রগ্রন্থাদির উল্টা অর্থ করিয়া জনসাধারণের কাছে প্রচার করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার নূতন নূতন পূজা যজ্ঞ ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা নিজেদের প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন, একথা রাজা রামমোহন রায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। লোকেও নানাপ্রকার লোভে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই সব পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়াও যখন ঈপ্সিত ফল পাইল না, তখন এই ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে লাগিল। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি কুসংস্কারমূলক প্রথার ফলে সমাজের গাত্রে পাপ প্রবেশ করিতে লাগিল। তথাকথিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, অন্যের কথা তো দূরে থাক, অতি রক্ষণশীল হিন্দুদেরই নিকটে হেয় বোধ হইতে লাগিল; এবং এই সুযোগে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদের স্বীয়-স্বীয় ধর্ম্মমতের প্রাধান্য প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মীদিগকে নিজ দলে টানিয়া লইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ক্রমে ক্রমে যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাতে মনে হয়, যদি সে সময়ে মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম প্রচার করিয়া বুঝাইয়া না দিতেন যে, যে সব অত্যাচার ও অন্যায় সমাজে চলিতেছে তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নয়, পরন্তু কতিপয়ের স্বার্থানুমোদিত মাত্র, তাহা হইলে হয় ত আজ হিন্দুর ধর্ম্ম বা সমাজের কোনও অস্তিত্বই আমরা দেখিতে পাইতাম না; আর যদিই বা সামান্য চিহ্ন থাকিত তাহা এত হীন ও কলুষিত অবস্থায় থাকিত যে, নিজেকে হিন্দু বলিতে যে কোনও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি লজ্জাবোধ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মগ্রন্থাদির পুনঃপ্রচার করিয়া ও তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা সকলকে জানিবার শুভ অবসর দিয়া প্রাচ্য ঋষিদের যুগযুগান্তের তপস্যা ও অভিজ্ঞতার ফল সমগ্র মানবজাতিকে উপভোগ করিতে দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মের মূলই সত্য এবং সত্যই আমাদের লভ্য। সত্যকে লাভ করিলেই মানব দুঃখ-শোকের অতীত হইয়া অমরত্বলাভ করে, বহুদিনের পর ব্রাহ্মসমাজই বহু আয়াস ও ঐহিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহা প্রচার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যঋষিদের প্রবর্ত্তিত মহা কল্যাণকর উপনিষদ ও বেদের ধর্ম্মকেই গ্রহণ করেন এবং কালের কুটিল গতিতে যে সকল অকল্যাণকর সংস্কার ও নিয়ম ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মের নামে প্রকৃত ধর্ম্মকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল তাহা বর্জ্জন করিয়া দেশ, কাল ও অবস্থা উপযোগী নিয়ম প্রচলিত করিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যখন আর্য্যঋষিদের অনুমোদিত ধর্ম্মই পুনরুদ্ধার করা হইল, তখন ভিন্ন নামে কেন তাহাকে অভিহিত করা হইল? তাহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ যাঁহারা কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম ছাড়িয়া সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন, স্বার্থপর ও কুসংস্কারাপন্ন সমাজপতি গুরু-পুরোহিত প্রভৃতি তাঁহাদিগকে নাস্তিক, বিধর্ম্মী ও ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া প্রচার করিতে ও তাঁহাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের আত্মরক্ষা ও স্ত্রী-পুত্রের রক্ষার জন্য একটি সংঘ গড়িয়া তুলিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে কেবল নিজেরা মুক্ত হইলেই চলিবে না, কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকে এই স্বাধীনতার আস্বাদ জানিতে দিতে হইবে, সকলকে এই ভূমানন্দ লাভ করিতে শিখাইতে হইবে। দেশকে ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধনে, মানে ও সততায় শ্রেষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। সকলকে জানাইতে হইবে যে তাহারা সকলেই অমৃতের সন্তান; সকলেই স্বাধীনতালাভের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ভগবানের নিকট সকলেই সমান এবং তিনি নিরপেক্ষ, নির্লোভ, শাশ্বত ও সনাতন এবং সর্ব্বদাই আমাদের কোলে ধরিয়া আছেন ও শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তিনি এক ও রূপহীন হইলেও আমরা যাহাতে তাঁহাকে না হারাই, সেইজন্য প্রতি অণুপরমাণুতেও মিশিয়া রহিয়াছেন। কোনও কার্য্যই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত নয়, অতএব কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়া সেই পরম করুণাময় পিতার বিরাগের কারণ না হই। এই পরম সত্যকে প্রচার করিতে হইলেও একটি সংঘের প্রয়োজন।

ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়াও নিজেকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চান নাই। যে কেহই হউক না কেন, যখনই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছেন কখনও বিফলমনোরথ হন নাই। অন্য ধর্ম্ম ও সমাজ মধ্যে থাকিয়াও যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ আদর্শকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ কেবল গুণেরই পূজা করিয়া আসিতেছেন, ঈশ্বরের প্রতি ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রাহ্মসমাজ চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও ব্রাহ্মসমাজের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আজ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কুসংস্কার, স্বার্থ বা ভীতি বশতও যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কুকথা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আজ যে সাদা-সিধা পোষাকপরিচ্ছদ ও চাল-চলন প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাও ব্রাহ্মসমাজেরই প্রভাবে। আজ যে ছুঁৎমার্গ পরিহার, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ-পরিহার প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে ইহাও ব্রাহ্মসমাজের

প্রাণপণ চেষ্টার পরিণাম ফলে; ছুৎমার্গ, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা যে আর্য্যধর্ম্মবিরোধী, ইহা একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ব্রাহ্মসমাজই প্রমাণিত করেন। স্ত্রীশিক্ষা যে সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং স্বামী ও স্ত্রীর যে সংসারে সমান দায়ীত্ব ও সমান মূল্য ইহাও আজ ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সুসংযত স্ত্রী-স্বাধীনতাও যে জাতি তথা দেশের কল্যাণের জন্য আবশ্যক তাহাও ব্রাহ্মসমাজের দ্বারাই এদেশে অন্ততঃ প্রচারিত হইয়াছে। মা সবল সুস্থকায় ও স্বাধীনচেতা না হইলে যে সন্তানও সেরূপ হইতে পারে না, তাহা ধীরে ধীরে লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষা ও গুণের আদর করিতে ব্রাহ্মসমাজই আমাদের শিখাইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত, ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজের কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া বুঝান কঠিন। আমার মনে হয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজের অনেক বাকী আছে এবং আমাদেরই তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীদের কাছে যাহা পাইয়াছি তাহা কেবল নিজেরাই আত্মসাৎ করিলে চলিবে না—ইহা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে, যাহাতে সমস্ত পৃথিবী এই সত্যকে জানিয়া পরম শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

এস আজ এই পবিত্র মন্দিরে এই শুভমুহূর্ত্তে সেই পরম দয়াল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি সকলকে তাঁহারই দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য করাইয়া লন। সমগ্র জগৎই যেন তাঁহার স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হয় ও তাঁহার সঙ্গ উপভোগ করিয়া পরমানন্দে ডুবিয়া থাকিতে পারে। তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র গম্য ও একমাত্র পূজনীয়। তিনিই আমাদের প্রত্যেকের পিতা মাতা পরিত্রাতা এবং ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; আজ সকল ইন্দ্রিয়সহ হৃদয় ও মন দিয়া তাঁহারই পদে আশ্রয় লইয়া ধন্য হই। তিনি আমাদের মধ্য দিয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লউন ও তাঁহার ইচ্ছামত পরিচালিত করুন।*

আগে চল্।

(শোভাযাত্রার গান)

লুম—পটতাল।

আগে চল্ মিলে চল্ চল ভাই চল যাই কাজ্ সাধিতে—
এক্ প্রাণে এক্ মনে।
এমন সুন্দর লেগে যাও কাজে সুরনর দেখিবে, অবাক নয়নে
হৃদয়ে হৃদয়ে পড়িবে বাঁধনে, সুখ-দুঃখ বহিতে॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী Mus. Doc. (Ind.)

১´ • ১´ • ১´ • ১
{II সা রা। গা -া I সা রা। গা -া I সা ন্া। ধ্া প্া I প্া ধ্া।
আ গে চ ল্ মি লে চ ল্ চ ল ভা ই চ ল

• ১´ • ১´ • ১´ • ১´
। ন্া সা I রা -া। সা ন্া I সা -া। -া -া I} সা -া। -া রা I পা -া।
যা ই কা জ্ সা ধি তে • • • এ • ক্ প্রা ণে •

• ১´ • ১´ •
। -া -া I মা -া। -া পা I গা -া। -া -া II
• • এ • ক্ ম নে • • •

১´ • ১´ • ১´ • ১´
I না -া। না না I র্সা -া। র্সা না I ধা না। র্সা না I পা ক্ষা।
এ • ম ন সু • ন্দ র লে গে যা ও কা •

• ১´ • ১´ • ১ • ১´
। পা -া I মা মা। গা গা I মা -া। ধা ধা I পা পা। মা -া I মা মা।
জে • সু র ন র দে • খি বে অ বা ক • ন য়

• ১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
। গা -া I পা পা। গা -া I মা মা। রা -া I গা গা। গা -া I গা গা। গা -া।
নে • হৃ দ য়ে • হৃ দ য়ে • প ড়ি বে • বাঁ ধ নে •

১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
I সা -া। রা -া I গা -া। পা -া I মা -া। গা রা। গা -া। -া -া II II
সু • খ • দু • খ • ব • হি • তে • • •

---

* গত ৮ই মাঘ বুধবার আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিবৃত।

ব্রাহ্মসমাজ ও শাস্ত্র।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

মানবীয় সভ্যতার প্রথম প্রভাতে ভারতীয় ঋষিদের তপোবন হইতে উষায় ও সন্ধ্যায় পবিত্র বেদগান আকাশ-বাতাস মুখরিত করিত; উপনিষদের তত্ব হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরব্রহ্মের চরণে আত্ম-নিবেদন করিতে সহায়তা করিত—যিনি অনলে অনিলে, যিনি সাগরে সরিতে, মরু গিরি পর্ব্বতে, যিনি হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে, তাঁহাকে পূজা করিতে শিক্ষা দিত। সেই সময়ে ভারতীয় সভ্যতার শান্ত রশ্মি বিশ্বভুবন আলোকিত করিয়াছিল; ভারতীয় দর্শন, বেদ-বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডাররূপে ভারতীয় ঋষির সাধনার পরিচয় ঘোষণা করিত দেশে দেশে কালে কালে।

কালচক্রনেমির অলঙ্ঘ্য পরিবর্ত্তনে আর্য্যঋষির দীপ্ত প্রতিভার দান অমূল্য শাস্ত্র অবজ্ঞাত হইল, অধ্যাত্মজাতি ভারতবাসী অধ্যাত্মতত্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক অকিঞ্চিৎকর পদার্থে মনোনিবেশ করিল। ডুবিল—কাল সাগরের অতল তলে সব ডুবিল—ধর্ম্ম ডুবিল—কর্ম্ম ডুবিল—স্বাধীনতার গৌরবসূর্য্য প্রতীচ্যের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিবার জন্য প্রাচ্যের উদয়াচল হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া নীলাম্বুধির অন্তহীন জলতলে লীন হইয়া গেল! বিরাজ করিতে লাগিল ভারতব্যাপী এক বিরাট অন্ধকার—অজ্ঞানের, কুসংস্কারের, ধর্ম্ম-বিমুখতার এক মোহ তিমির! যেদিকে তাকাই, সব দিকেই দেখি অন্ধকারের অট্টহাসি! মোগল-রাজত্বের শেষ ভাগ হইতে ইংরেজ-রাজত্বের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ভারতের এই মোহতিমিরের রাজত্ব।

সেই সময় হিন্দুজাতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্মরণ করিলে দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। মনে হয়, যে হিন্দুজাতি একদিন জগতের বরেণ্য শীর্ষস্থানীয় ছিল—আজ তাহার কি অধঃপতন! ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান ভারত হইতে নির্ব্বাসিত, বেদের ধ্বনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় হোমধূম-সুরভিত আকাশকে প্রতিধ্বনিত করে না; জাতিভেদের প্রবল নিস্পেষণে ভারতবাসী নিষ্পিষ্ট; সকলেরই মুখে এক কথা—আমায় ছুঁয়ো না; কুসংস্কারের শত বন্ধনে হস্তপদ বদ্ধ; গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরবার পথে যদি কোন অস্পৃশ্য জাতির অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ হয়, তখনি আবার ফিরিয়া গঙ্গায় গমন করিয়া স্নান করিতে হইবে—নতুবা নিস্তার নাই! ধর্ম্ম বাহ্যিক আচারে পর্য্যবসিত—তিলক-ফোঁটা লইয়া মারামারি কাটাকাটি; পঞ্চোপচার ষোড়শোপচারই মানসরাজ্য জুড়িয়া বসিয়া রহিল, ভক্তি সরিয়া গেল দূরে, জ্ঞান পলায়ন করিল হিমালয়ের গহ্বরে। ঈশ্বর? বোধ হয় তিনি ন্যায় ও স্মৃতির আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া গেলেন—রহিল বাহ্যিক ধর্ম্মের আবরণে প্রকাণ্ড মিথ্যাচার—নাস্তিকতার দিগন্তব্যাপী প্রতিচ্ছবি।

বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র আর কেহ আলোচনা করিত না। মাত্র কোথাও কোথাও পিতৃপুরুষের নিকট প্রাপ্ত শালগ্রাম শিলার সঙ্গে সেই সমস্ত শাস্ত্র পুঁথির আকারে চন্দনলিপ্ত হইয়া পূজা লাভ করিত—অনেক পুঁথি জীর্ণ, কীটদষ্ট অবস্থায় ক্রমশঃ কালের ও কুক্ষিগত হইতেছিল!

ভারতের এই অবনতির অবস্থায় মনে হইল, বুঝি আর এই অমানিশার অন্ধকার তিরোহিত হইবে না—উষার আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিবে না প্রাচীর উদয়াচলে; মনে হইল বুঝি, এইবার আত্মজ্ঞানবিমূঢ় ভারতবাসীর নাম জগতের বক্ষ হইতে চিরতরে মুছিয়া গেল।

কিন্তু বিধাতার বিধানে অমানিশারও অবসান হয়; আবার কঠোর হিমযামিনীর অবসানে দিব্যপ্রভা-বিলসিনী হেমকায়া উষা নিদ্রার রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করে; সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ হাসিয়া উঠে পুরমন্দির-দেউলে, বৃক্ষরাজির উন্নত শিরে, প্রস্ফুটিত ফুলদলে, নির্ঝরিণীর চঞ্চল তরঙ্গরঙ্গে; ভারতের মুক্তির পথও বিধাতৃবিধানে খুলিয়া গেল। যাহা কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, সত্য সত্যই ভারতের ভাগ্যে সে মহাদিন উপস্থিত হইল; অদৃষ্টদেবী ভারতের কণ্ঠদেশে বরণীয় লোভনীয় রত্নহার দুলাইয়া দিলেন।

শত বৎসর পূর্ব্বে এমন এক মহাপুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন; আমাদের সৌভাগ্যবলে—যিনি অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের বুকে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধ নয়ন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উন্মীলিত করিয়া দিলেন; যিনি স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে ভারতের তপোবন-নিহিত লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রকে পুনরায় স্বীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়।

সে এক মহা স্মরণীয় দিন—যেদিন সত্যান্বেষী রামমোহন সহস্র বাধা-বিঘ্ন পদতলে দলিত করিয়া সত্যের পূজার জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া মিথ্যাচার ও নাস্তিকতার মূলে কুঠারাঘাত করেন। যে উন্নতির বন্যা আজ হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিপ্লাবিত করিতেছে—তাহার মূলে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ। আজ যে দেশ-বিদেশে, প্রাচ্যে প্রতীচ্যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের আদর দেখা যাইতেছে, বেদ-বেদান্ত-গীতা-উপনিষদ্ বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে—তাহার মূলে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ।

সত্যান্বেষী রামমোহন যখন সত্যতত্ব নির্ণয়ের জন্য

বেদান্তদর্শন পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি দেখিলেন ভারতের গৌরব বেদান্তদর্শন বাঙ্গালার কোথাও পাওয়া যায় না; অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাটীতে খোঁজ করিতে করিতে এক স্থানে বেদান্তদর্শনের হস্তলিখিত পুঁথি চন্দনচর্চ্চিত অবস্থায় দেখিতে পান। বহু আয়াসে সেই কীটদষ্ট, চন্দনচর্চ্চিত পুঁথি হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া পাঠ করেন। তৎপরে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের অন্বেষণে দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছেন—এমন কি তখনকার ঠগী-দস্যুসঙ্কুল স্থানের মধ্য দিয়া সুদূর তিব্বতে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই অদম্য অধ্যবসায়বলে রামমোহন উপনিষদ্ ও বেদ অধ্যয়ন করতঃ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন।

এই শাস্ত্রচর্চ্চার মধুময় ফল তাঁহার জীবন-কল্পবৃক্ষ হইতে সমুদ্ভূত হইল—লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রবহির্ভূত ইংরাজী শিক্ষার ফল, তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র-নিহিত অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞান, এবং উহা লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে উপদেশই দেশকে রামমোহনের দান—উহাই তাঁহার 'বাণী'।

এই জন্য তিনি শঙ্করের অদ্বৈত মতের পন্থী না হইয়া দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে পরব্রহ্মের উপাসনার প্রচলন করেন। বাস্তবিক, আজ হিন্দু যে বলিতেছে, আমি পুতুল বা মূর্ত্তিপূজা করি না, মূর্ত্তির মধ্য দিয়া পরব্রহ্মের পূজা করি—মূর্ত্তি প্রতীক মাত্র—তাহাও এই ব্রাহ্মসমাজের দান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তার পর, রামমোহন সর্ব্বসাধারণের জন্য শাস্ত্রপ্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, যদি সাধারণ লোক শাস্ত্রে কি আছে, তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারে, তবে আর তাহারা কুসংস্কারে বশীভূত হইবে না। উক্ত উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া তিনি ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি ছয়খানি উপনিষৎ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন এবং ঐ সমস্ত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশ করেন। এই উভয়বিধ অনুবাদ-কার্য্যে রামমোহনকে প্রথম পথপ্রদর্শক বা pioneer বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। তিনি ভগীরথরূপে শাস্ত্রগঙ্গার পূত-নির্ম্মল ধারা হিমাচল-সদৃশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই ভারতের দীনতম ব্যক্তির কুটীরপ্রাঙ্গণ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত করিয়াছেন।

রামমোহন অকালে বৃষ্টল নগরে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য লুপ্ত হইল না; মঠের মোহান্তের দেহত্যাগে চেলা যেমন গদী অধিকার করিয়া দেবসেবার ভার গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি রামমোহনের লোকান্তরের পর যে আত্মত্যাগী সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের প্রতিভাদীপ্তি ব্রাহ্মসমাজকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, যিনি রামমোহনের আরব্ধ অসম্পূর্ণ কার্য্য স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন—তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, দেবেন্দ্রনাথ উহার রক্ষাসাধক ও উন্নতিবিধাতা; রামমোহন শাস্ত্রপ্রচারে পথপ্রদর্শক, দেবেন্দ্রনাথ উহার পুষ্টিসাধক। মহারাজ অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মও তদ্রূপ উন্নতি ও প্রসার লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

মহর্ষি দেখিলেন, সকলেই বেদের দোহাই দেয়, অথচ বেদে কি আছে, তাহা কেহই জানে না। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে বৈদিক জ্ঞানপ্রচারের জন্য মহর্ষি সংক্ষিপ্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ঋগ্বেদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল শরতের কমলবনে সূর্য্যকিরণের মত। ঋগ্বেদের অনেকাংশ প্রকাশিত হইবার পর মহর্ষি দেখিতে পান, পণ্ডিত-প্রবর MaxMuller ঋগ্বেদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। Max Muller তত্ত্ববোধিনীর ঋগ্বেদ-প্রকাশের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং ইহাও স্বীকার করেন যে, তাঁহার বেদপ্রকাশের অনুপ্রেরণা তিনি তত্ত্ব-বোধিনী হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মহর্ষি ভাবিলেন, শাস্ত্রপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যে শক্তি বিভক্ত হইলে কার্য্যের হানি হয়; সুতরাং Max Muller যখন বেদ প্রচার করিতেছেন, যখন যোগ্য ব্যক্তি উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন মহর্ষির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি নাম চাহিতেন না, চাহিতেন জগতের কল্যাণ; সুতরাং তিনি ঋগ্বেদপ্রকাশে ক্ষান্ত হন।

গ্রাম্য সরোবরের কালো জলে মুদিত শতদল যেমন প্রভাতসূর্য্যের কনক-কিরণ-স্পর্শে একটি একটি করিয়া দলরাজি বিকশিত করিতে থাকে, তেমনি মহর্ষির কোমল করপল্লবস্পর্শে শাস্ত্রশতদলও দলরাজি বিকশিত করিতে লাগিল। তৎপরে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রামাণ্য উপনিষৎগুলি সংক্ষিপ্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। রামমোহন-প্রচারিত ঈশ কেন প্রভৃতি ছয়খানি উপনিষদ্ও টীকাসহ প্রকাশ করেন। তত্ত্ববোধিনীর সহায়তায় এই সমস্ত উপনিষৎ প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। উপনিষদ্ প্রচার করিয়া মহর্ষি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আনন্দ বেদান্ত-বাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দ্বারা সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের প্রবন্ধ লিখাইয়া তত্ত্ব-

বোধিনীতে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। আদিব্রাহ্মসমাজ হইতেই শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য শ্রীধরস্বামী ও আনন্দগিরির টীকা এবং বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। আজকাল যেখানে সেখানে শাস্ত্রপ্রচারের কার্য্যালয় সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রমালার মত যে পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহার মূলে সূর্য্যরূপী দেবেন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টা বর্ত্তমান। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের তত্ত্বাবধানে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে মহাভারত অনূদিত করেন, তাহাও প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই শাস্ত্রসঙ্কলন কার্য্যে ব্রতী হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে স্যার উইলিয়ম জোন্সপ্রতিষ্ঠিত Asiatic society পুঁথি সংগ্রহ করিত না, কিন্তু মহর্ষির এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা সোসাইটীর সভ্যগণের গোচরীভূত হইবার পর Asiatic society পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত হন। আজকাল এসিয়াটিক সোসাইটির বিরাট পুঁথিবিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে—ভারত গবর্ণমেণ্ট ৫ বৎসর অন্তর পুঁথি সংগ্রহের জন্য দশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন—কিন্তু ঐ প্রচেষ্টার মূলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এসিয়াটিক সোসাইটীকে পুঁথিসংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া যে উদ্দেশ্যে তিনি ঋগ্বেদ প্রকাশ পরিহার করিয়াছিলেন, ঠিক সেই মহান্ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পুঁথিসংগ্রহ কার্য্য পরিত্যাগ করেন। যদিও মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রকাশিত নহে, প্রথম ছাপান চণ্ডী হিন্দু কম্পোজিটর ও হিন্দু প্রেসম্যানের সাহায্যে আদিব্রাহ্মসমাজের প্রেস হইতেই ছাপা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজকে উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে তুলিয়া দিয়া মহর্ষি লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শাস্ত্রপ্রচার বন্ধ হয় নাই। আদিব্রাহ্মসমাজ মহর্ষির প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিতেছে। আদিব্রাহ্মসমাজ 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' প্রকাশ করিয়া মহর্ষির ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' সাধারণ্যে বিশেষ সমাদৃত। বিশেষত ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে যখন গীতার interpolation theory বা প্রক্ষিপ্তবাদ বিখণ্ডিত করা হয়, তাহাতে দেশে রীতিমত একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এখনও শাস্ত্রপ্রচারের প্রচেষ্টা সমভাবে চলিতেছে।

আজ এই শত বর্ষ পরে দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রপ্রচারে যাহা করিয়াছে, অন্য কোন সমাজ তাহা করে নাই। ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচেষ্টার জন্য আজ সমগ্র সভ্যজগৎ ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী।

শাস্ত্রপ্রচারের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠা এদেশবাসীর হৃদয়ে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, দেশে যদি লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞান পুনরায় পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচেষ্টার ফলে যদি দেশে দেশে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রভাত-সূর্য্যের হিরণকিরণের মত ছড়াইয়া পড়ে, দেশবাসীর হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যদি উন্মুখ হইয়া উঠে, তবেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও শতবর্ষব্যাপী চেষ্টা সার্থক হইবে।

যে মহাপুরুষদ্বয় শাস্ত্রপ্রচারের পথপ্রদর্শক, আজ এই শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহারা আনন্দময় অমৃতময় ব্রহ্মলোক হইতে ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য জয়যুক্ত হউক।*

বাঙ্গলা সাহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান।

(শ্রীনিরঞ্জন সরকার)

আজকাল যে সমস্ত পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গলা ভাষা যে কতটা পরিমাণে তত্ত্ববোধিনী ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বাঙ্গলা ভাষার আর সে দিন নাই; দেখিতে দেখিতে এই ভাষা বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে; কত ছোট-বড় সাহিত্যিক প্রতিদিন বাঙ্গলা ভাষাকে পুষ্ট করিতেছেন—কিন্তু কাহারা এই ভাষাকে গড়িয়া তুলিলেন তাহা দেখিতে গেলে আমাদিগকে পুনরায় সেই প্রাচীনকালের বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন দেখিতে পাইব, এ ভাষায় তত্ত্ববোধিনী ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের দান কত বড়।

রাজা রামমোহন।

বহুপূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্য ছিল না। বাঙ্গলা গদ্য যে একেবারে ছিল না তাহা বলিলে ভুল হইবে। ছিল, কিন্তু তাহা কেবল গ্রাম্য চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হইত, তাহার দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর ছিল না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন তাঁহার নবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তিনি বাঙ্গলা ভাষার সহায়তা লইলেন, এবং বাঙ্গলা গদ্যকে সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি ভাষার জড়তা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেন না।

* গত ৮ই মাঘে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

ঈশ্বরচন্দ্র।

মহাত্মা রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা গদ্যের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বাঙ্গলা গদ্যের স্রোত ফিরাইয়া দিলেন। রামমোহনের পরবর্ত্তীযুগের বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃতের ভয়ানক প্রভাব দেখা যায়, বড় বড় সমাস প্রভৃতির ভার তখন এত বেশী ছিল যে, তাহার স্বচ্ছন্দে নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতা ছিল না। বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা ভাষাকে সমাসের শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া মুক্তি দিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি ইহাকে সুসংযত করিলেন, তাহাতে একটা অনতিলক্ষ্য ধ্বনি-সামঞ্জস্য যোজনা করিয়া দিলেন। বাঙ্গলাভাষা তখন আর কেবলমাত্র গ্রাম্য পণ্ডিতের ভাষা রহিল না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতের প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পান নাই, তাঁহার লেখার মধ্যে সংস্কৃতের ছাপ রহিয়া গিয়াছে; সেইজন্য তাঁহার সাহিত্যে অলঙ্কারের আধিক্য দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষায় শক্তি আছে, তেজস্বিতা আছে, কিন্তু তত পরিমাণে সহজ গতি নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই বাঙ্গলা ভাষার এ দৈন্য দূর করিয়াছিলেন; তত্ত্ববোধিনী তাঁহার সেই দান আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী।

দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ তাঁহার ধর্ম্মমত সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইলে সাধারণে তাঁহার বাণীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইজন্য তাঁহাকে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিসাধনের জন্যও চেষ্টা করিতে হইয়াছে। এবং এই জন্যই তিনি ভাষার সহজ গতি দান করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পরিচালনার ভার দেন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে। তাঁহার সম্বন্ধে মহর্ষি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ ইত্যাদি তত্ত্ববোধিনীর জন্য লিখিবেন তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তিনি নিজে দেখিয়া দিলে তবে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যেও আমরা তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাই।

অক্ষয় দত্ত।

তাহা ভিন্ন দেবেন্দ্রনাথই প্রথম অক্ষয়কুমার দত্তকে নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি রচনা করিতে উৎসাহ দিয়া এবং তাহা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করাইয়া পরোক্ষভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে এই সকল বিষয় আলোচনার সূত্রপাত করেন। এ বিষয়েও বাঙ্গলা ভাষা তাঁহার নিকট চিরঋণী।

এইত গেল পরোক্ষভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার দান। তাঁহার নিজের রচনার মধ্যে মাত্র দুইখানি বই আমরা দেখিতে পাই। একখানি পত্রাবলী, অপরখানি তাঁহার আত্মচরিত। * তাঁহার আত্মচরিত পাঠ করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে কিরূপ সহজভাবে তিনি বাঙ্গলা লিখিতেন এবং কিরূপে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে সুললিত বাক্‌ছন্দের সৃষ্টি করেন। এখন বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের যুগে বসিয়া হয়ত ধারণাও করিতে পারিব না যে তাঁহার সাহিত্য পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে কত উচ্চে উঠিয়াছিল; সেই পুরাতন ভাষার সহিত তুলনা করিলে তবেই বুঝিতে পারিব।

তিনি যেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অন্য কোন বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে শব্দের আড়ম্বর নাই, অলঙ্কারের ছটা নাই; আছে শুধু সরস, সরল, হৃদয়গ্রাহী ভাষার মাধুর্য্য। তাঁহার সে ভাষা কোথাও বাধে না; তরতর করিয়া স্বচ্ছ, নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর মত বহিয়া যায়। তাঁহার সুললিত বাক্‌ছন্দের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এইরূপ তাঁহার বহু দান বঙ্গভাষায় আছে; আজ হয় ত সে সবগুলির সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও, একদিন যাঁহাদের চেষ্টায়, আমাদের মাতৃভাষার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ যদি আমরা তাঁহাদের কথা ভুলিয়া যাই তবে তাহা আমাদের অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক হইবে। †

অধিবাসন।

(শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস)

একতারা তোর মধুর সুরে, বাজারে ভাই বাজা।
প্রভুর বেদী ভরা রে ভাই, সুবাস কুসুম তাজা॥
ভক্তিপ্রদীপ ধূপের সাথে,
জ্বালিস্ পূজার আঙ্গিনাতে,
শুভ্র কোমল পরাণ-পাতে,
অধিবাসন সাজা॥
ভাঁড়ারে তোর যা কিছু ধন আছে রে ভাই আছে,
আনিস্ সকল উজোড় করে, আজকে প্রভুর কাছে;
আজকে সাঁজে, বারে বারে,
ডাকিস্‌রে ভাই সবাকারে,
আসে যেন দেউল-দ্বারে,
দেখতে হিয়ার রাজা॥

---

* ইহা ব্যতীত তাঁহার বহু রচনা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তং সং

† মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথিতে শান্তিনিকেতনে তাঁহার স্মৃতিসভায় পঠিত।

সঙ্ঘের প্রসার।

উপাসনা ও উপাসিকা।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

গৌতম নবদীক্ষিত কশ্যপ-ভ্রাতৃত্রয় সমভিব্যাহারে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরপ্রান্তবর্ত্তী যষ্টিবনে সমুপস্থিত হইবা মাত্রই বনরক্ষিগণ রাজ-সকাশে তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করিল। মহারাজ বিম্বিসার রাজন্যবর্গসহ অবিলম্বে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

এতদঞ্চলে প্রাচীন তাপস কশ্যপের অত্যন্ত খ্যাতি ও সম্মান ছিল। কেহ কেহ ভাবিলেন, সম্ভবতঃ গৌতম কশ্যপমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কশ্যপ সর্ব্বসমক্ষে বুদ্ধের পদবন্দনা করিয়া সকলের সন্দেহ মোচন করিলেন। বিমুগ্ধ রাজা রাজন্যবর্গসহ তথাগতের শরণ গ্রহণ করিলেন। যশের পিতার পর বিম্বিসারই দ্বিতীয় উপাসক * বলিয়া পরিগণিত হইলেন। প্রত্যহ বুদ্ধ-দর্শনে এতদূর যাতায়াত কষ্টকর বলিয়া বিম্বিসার রাজধানীমধ্যস্থ বেণুবন নামক উদ্যানবাটী বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিলেন। দান পরিগৃহীত হইলে বুদ্ধ সশিষ্যে বেণুবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।†

স্বয়ং মহারাজা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া মগধবাসিগণ দলে দলে বুদ্ধের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মগধরাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মবক্তা ও ধর্ম্মাচার্য্যরূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।

রাজা শুদ্ধোদন সংবাদ পাইলেন, তদীয় তনয় বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজগৃহে অবস্থান করিতেছেন। পুত্র-দর্শনেচ্ছু হইয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়নের জন্য বহু জনসমভিব্যাহারে জনৈক রাজ-পুরুষকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যে সময় বেণুবনে আসিয়া পৌছিলেন, বুদ্ধ তখন ধর্ম্মব্যাখ্যায় নিরত ছিলেন। বুদ্ধের সর্ব্বতাপহর উপদেশামৃত পান করিয়া সকলেরই সংসারে বিরাগ জন্মিল—তাঁহারা তথাগতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোধন কোন সংবাদ না পাইয়া অপর একটি দলকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারেও কেহ ফিরিয়া আসিল না, কোন সংবাদও তিনি পাইলেন না। এইরূপে একাদিক্রমে নয়টি দল প্রেরণ করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন। পরিশেষে একদিন গৌতমের বাল্যসহচর ও বিশ্বস্ত অমাত্য কালোদায়ীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। যাহাতে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয়, কালোদায়ীকে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। বাল্যসখা গৌতমের সহিত পুনর্ম্মিলনের সম্ভাবনায় কালোদায়ী পরম পুলকিত হইলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৌতমের সুখদুঃখের সমভাগী হইবার তাঁহার প্রবল বাসনা হইল। তিনি শুদ্ধোদন সমীপে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্যথিতান্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করিয়া রাজা কহিলেন,—"কিন্তু, উদায়ী, যেরূপেই হউক গৌতমকে একবার কপিলবস্তুতে লইয়া আসিতে হইবে"। কালোদায়ী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সঙ্গিগণসহ যাত্রা করিলেন। বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণে কালোদায়ীর মন অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিল—প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া শুদ্ধোধন ক্ষুব্ধচিত্তে নিরাশ হইলেন।

বুদ্ধ বারাণসীর মৃগদাবে বর্ষাবাস * করিলেন। অতঃপর শীতঋতু উরুবেলায় অতিবাহিত হইল। বসন্তাগমে তিনি বেণুবনে পুনরাগমন করিলেন। এই সময়ে একদিন কালোদায়ীর স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। ফাল্গুনী পূর্ণিমারাত্রে তিনি বুদ্ধের সমীপস্থ হইয়া উচ্চকণ্ঠে বসন্তশোভার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখনকার সুন্দর পথসমূহে দূরভ্রমণে বহির্গত হওয়া যে কিরূপ সুখকর, তিনি সুসংবদ্ধ ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ বুঝিলেন,ইহার ভিতর কালোদায়ীর কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। জিজ্ঞাসিত হইয়া কালোদায়ী সবিনয়ে শুদ্ধোধনের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। তাঁহার অনুরোধে বুদ্ধ কপিলবস্তুতে যাইতে সম্মত হইলেন।

অতঃপর বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধ কপিলবস্তু যাত্রা করিলেন। আকাশপথে কালোদায়ী যাইয়া পূর্ব্বেই সেখানে সংবাদ দিয়া আসিলেন। বংশগৌরবোন্মত্ত শাক্যগণ ভিখারী গৌতমকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। কালোদায়ী বহু তর্কযুক্তির ফলে তাহাদের ভ্রম দূর করিলেন। ক্রমাগত দুইমাসকাল পথ চলিয়া বুদ্ধ ন্যগ্রোধবনে পৌছিলেন। শাক্যগণ

* উপাসক—গৃহীভক্ত।

† জৈনগণ বিম্বিসারকে মহাবীরের শরণাপন্ন বলিয়া দাবী করেন। "One of the staunchest champions of Jainism"—Vide Heart of Jainism—Sinclair Stevenson, pp. 41. সম্ভবতঃ তৎকালীন বহু রাজগণের ন্যায় বিম্বিসারও সকল গুণবান ধর্ম্মবক্তার গুণগ্রাহীমাত্রই ছিলেন।

* তৎকালে সকল পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বর্ষার তিনমাস স্থির হইয়া একস্থানে অবস্থান করিতেন। কোন কোন গ্রাম বর্ষাবাসের জন্য আবাহন করিত। সেই গ্রামকে ঐ সময়ের জন্য নিমন্ত্রিতদলের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। ত্যাগীদলও প্রতিদানে গ্রামবাসিগণকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করিতেন।

সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠরাজবংশের আভিজাত্যাভিমান সহজে যাইবার নহে। শাক্যগণ অল্পবয়স্ক শাক্যকুমার ও কুমারীগণকে অগ্রগামী হইয়া বুদ্ধের অভ্যর্থনা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ শাক্যগণের কেহবা সম্পর্কে গৌতমের জ্যেষ্ঠতাত, কেহ বা খুল্লতাত, কেহ বা অগ্রজ ইত্যাদি। তাঁহারা কেহই গৌতমকে অভিবাদন তো করিলেনই না, যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের মানসিক বিকৃতাবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিভূতি সহায়ে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিলেন। তিনি শূন্যারূঢ় হইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। শুদ্ধোদন তদ্দৃষ্টে—"এই তৃতীয়বার তোমায় প্রণাম করিতেছি" বলিয়া পুত্রকে অভিবাদন করিলেন। অন্যান্য শাক্যগণের মস্তকও সঙ্গে সঙ্গে আনত হইল।

বুদ্ধ যথারীতি ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। রাজ-কুমারকে ভিক্ষার্থী দেখিয়া পুনরায় শাক্যগণের বংশ-মর্য্যাদাজ্ঞান জাগিয়া উঠিল। তাঁহারা বুদ্ধের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। রাজা শুদ্ধোধন আসিয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আবেগভরে বলিলেন, "আমার পুত্রের ভিক্ষাবৃত্তি শোভা পায় না, ক্ষান্ত হও, গৌতম। আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার হাতে, যাহা ইচ্ছা যত ইচ্ছা ভাণ্ডার হইতে লও। ভিক্ষা ত্যাগ কর।"

বুদ্ধ শান্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"এ আমাদের কুল-রীতি মহারাজ!"

"না গৌতম, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কেহ কখনও ভিক্ষা করেন নাই।"

"ভুল করিতেছেন রাজা, আপনি রাজবংশধর। আমার পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বগামী বুদ্ধগণ। প্রত্যেক বুদ্ধই ভিক্ষায়ে জীবন ধারণ করিতেন।" অনন্তর বুদ্ধ শুদ্ধোদনকে সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

উত্তিট্‌ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ॥
ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ;

"উঠুন, আলস্য ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম আচরণ করুন। ধর্ম্মাচারী ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখ লাভ করেন। সদ্ধর্ম্ম আচরণ করুন; অসদ্ধর্ম্ম আচরণ করিবেন না; ধর্ম্মাচারী ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন।"

উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে রাজা নির্ব্বাণপথে বহুদূর অগ্রসর হইলেন। তিনি আর বাধা প্রদান করিলেন না—গৌতমের ভিক্ষাপাত্র স্বয়ং বহন করিয়া শিষ্যগণসহ তাঁহাকে প্রসাদে লইয়া গেলেন এবং শ্রেষ্ঠ ভোজ্যসামগ্রী দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিলেন। আহারান্তে পুরনারীগণ একে একে বুদ্ধদর্শনে আগমন করিলেন। আসিলেন না কেবল অভিমানিনী যশোধরা। বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন সহ যশোধরার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই যশোধরার সমস্ত অভিমান দূর হইল, তিনি তাঁহার পদতলে প্রণত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন তখন সমীপবর্ত্তী হইয়া গৌতমের ভিক্ষুবেশ ধারণের সংবাদ পাইয়া যশোধারা কিভাবে তদনুরূপ বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার একাহারের সংবাদ পাইয়া কিভাবে একবেলা আহার আরম্ভ করেন, তাঁহার ভূশয্যার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিরূপে স্বয়ং পালঙ্কে শয়ন ত্যাগ করেন, তৎ-সমুদয় বিবৃত করিতে লাগিলেন। যশোধরার এই বিলাসত্যাগ ও সংযমাভ্যাসের সংবাদে বুদ্ধ পরম হৃষ্ট হইলেন।

সপ্তাহকাল কপিলবস্তুতে শান্তিবার্ত্তা প্রচার করিয়া তিনি পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শীতবনে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময়ে শ্রাবস্তিনগরের শ্রেষ্ঠ বণিক অনাথপিণ্ডিক রাজগৃহে আগমন করিয়া তদীয় কোন বন্ধুর নিকট বুদ্ধের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করেন। বন্ধুর আগ্রহে তিনি বুদ্ধদর্শনে শীতবনে গমন করেন। অনাথপিণ্ডিকের গুপ্ত নাম ছিল—'সুদত্ত'। তিনি মনে স্থির করিলেন বুদ্ধ যদি তাঁহাকে ঐ নামে আহ্বান করিতে পারেন, তবেই কেবল তিনি তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করিবেন। বুদ্ধের সম্মুখীন হইতেই তিনি তাঁহাকে 'সুদত্ত'নামে আহ্বান করিলেন। অনাথপিণ্ডিক চমৎকৃত হইয়া তথাগতের শরণ গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধের উপদেশশ্রবণে তাঁহার স্রোতাপত্তি ফললাভ হইল।

অনাথপিণ্ডিক শাস্তাকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সম্মতি পাইয়া তিনি অবিলম্বে শ্রাবস্তিতে চলিয়া গেলেন। জমিতে পাশাপাশিভাবে স্বর্ণ-মুদ্রার স্থান লইল * এতমূল্যে যুবরাজ জেতের প্রমোদো-দ্যান 'জেতবন' ক্রয় করিয়া তথায় বহু অর্থব্যয়ে এক প্রকাণ্ড বিহার (মঠ) নির্ম্মাণ করিলেন। যথাসময়ে বুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার হস্তে জল-প্রক্ষেপ করিয়া সেই † সুরম্য জেত-বনবিহার সঙ্ঘকে দান করিলেন।

শ্রাবস্তির অপর বিখ্যাত বণিক মিগারও পুত্রবধূ বিশাখার যত্নে, জৈনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধের

* ১৮ কোটী রৌপ্যমুদ্রা।
† তদানীন্তন প্রথা।

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিশাখা অঙ্গের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী ভদ্রিয়ের কন্যা। বুদ্ধ যখন অঙ্গরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, বিশাখা সেই সময়ে পিতার সহিত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিগারের গৃহে নগ্ন সন্ন্যাসীগণ যাতায়াত করিতেন। মার্জ্জিতরুচি বিশাখা এ সকল কদাচার পছন্দ করিত না। এজন্য মিগার তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিতেন। কিন্তু বিশাখার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মিগার একবার বুদ্ধদর্শনে যাইতে সম্মত হন। বুদ্ধের দিব্য কান্তি-দর্শনে ও তাঁহার অমৃতবর্ষী উপদেশশ্রবণে সদ্‌-গুণসম্পন্ন সকলের এপর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে, মিগারেরও তাহাই হইল। মিগার তথাগতের শরণ গ্রহণ করিয়া পুত্রবধূকে 'মিগারমাতা' নামে ভূষিত করিলেন।

বিশাখা শ্রাবস্তিতে পূর্ব্বারামবিহার নামক আর একটি সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া, সংঘকে তাহা দান করিলেন। উপাসিকাশ্রেণীর মধ্যে বিশাখার জন্য শ্রেষ্ঠাসন নির্দ্দিষ্ট হইল। বিশাখা বুদ্ধের নিকট আটটি বর চাহিয়া লইলেন:—(১) বুদ্ধের নিকট কোন ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বিশাখার নিকট পাঠাইবেন, বিশাখা ঐ ভিক্ষুকে ভক্ষ্যদ্রব্য দিবেন; (২) বিশাখা আজীবন প্রতিদিন পঞ্চশত ভিক্ষুর আহার যোগাইবেন; (৩) কোন ভিক্ষুর পীড়া হইলে তাহার পথ্যাদির জন্য যাহা আবশ্যক বিশাখা তাহা সমস্ত নির্ব্বাহ করিবেন; (৪) যাঁহারা পীড়িতের শুশ্রূষা করেন বিশাখা তাঁহাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিবেন; (৫) বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য যে খাদ্য দিবেন, বুদ্ধ নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিবেন; (৬) প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর প্রত্যেককে চীবরাদি অষ্ট 'পরিষ্কার' দান করিবেন; (৭) বিহারের জন্য যত ঔষধের প্রয়োজন সমস্ত বিশাখার নিকট হইতে আনিতে হইবে, এবং (৮) বিশাখা প্রতি বৎসর সমস্ত ভিক্ষুকে 'কণ্ড প্রতিচ্ছাদন' নামক পরিচ্ছদ দান করিবেন। *

রাজগৃহে বর্ষাবাস করিবেন স্থির করিয়া বুদ্ধ অতঃপর মগধরাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এইস্থানে তিনি পীড়িত হইলে, রাজবৈদ্য জীবক আসিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিলেন।

বৈশালী নগরে আম্রপালীনাম্নী অতুলনীয় রূপগুণ-সম্পন্না এক বারাঙ্গনা বাস করিত। মগধরাজ উহার খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া আপন রাজধানীর জন্য ততোধিক রূপগুণশালিনী নারীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শালবতীকে তাঁহার পছন্দ হওয়ায় তিনি যথাযোগ্য প্রাসাদ-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। * কালে তাঁহার পুত্র রাজকুমার অভয়ের ঔরসে এই বারনারীর গর্ভে এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজকুমারের অজ্ঞাতসারে এই নবজাত শিশুকে অরণ্যে নিক্ষেপ করা হয়। রাজকুমার শিকারান্বেষণে অরণ্যে গমন করিয়া বনমধ্যে এই শিশুকে আবিষ্কার করেন। তখনও শিশু জীবিত ছিল বলিয়া তিনি ইহার নাম 'জীবক' রাখেন। এই শিশু যে তাঁহারই সন্তান তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

জীবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অভয়কে আপনার মাতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু অভয় তাঁহার পিতা-মাতার সন্ধান অবগত নহেন জানিতে পারিয়া জীবক ক্ষুণ্ণ হইলেন। জীবকের এতকাল ধারণা ছিল অভয়ই তাঁহার পিতা। কিন্তু এখন তিনি দেখিলেন যে তিনি মগধরাজ্যের উত্তরাধিকারী নহেন। ভাবী জীবনযাত্রার উপায় স্থির করিবার মানসে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে একদিন তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন।

তক্ষশিলার মহাবিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যের অধীনে শিক্ষালাভ করিয়া জীবক অল্পকাল মধ্যেই আয়ুর্ব্বেদ ও শল্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শিক্ষান্তে গুরুর অনুমতি লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে অভয় তাঁহাকে আপন পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। জীবক ফিরিয়া আসিলে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে রাজকুমারের আসন দান করিলেন। মহারাজ বিম্বিসারকে চিকিৎসাগুণে নীরোগ করিয়া জীবক রাজবৈদ্যের স্থান অধিকার করিলেন।

বুদ্ধের পীড়ার সংবাদ পাইয়া মহারাজ জীবককে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিলেন। জীবকের ব্যবস্থায় তিনি ক্ষণেকের মধ্যেই সুস্থ হইলেন। কিন্তু রোগীকে রোগ-মুক্ত করিয়া জীবক চিকিৎসিতের নিকট আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সে মধুবর্ষী বাণী, সে অপূর্ব্ব দেহকান্তি, সে অন্তর্ভেদী স্নেহদৃষ্টি জীবককে সম্মোহিত করিল। জীবক তথাগতের শরণ লইলেন। আপন উদ্যানবাটীতে প্রাসাদোপম বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তিনি তাহা সঙ্ঘকে দান করিলেন।

রাজগৃহের বেণুবনে তাঁহার তৃতীয় বর্ষাবাসের সময় লিচ্ছাধরাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত মহামারী

* ঈশানচন্দ্র ঘোষ—জাতক ১ম খণ্ড—২৮৯ পৃষ্ঠা।

* এই শ্রেণীর নারীকে 'নগরশোভিকা' বলিত। প্রত্যেক নগরে এইরূপ নারী পরিপোষণ তখনকার রাজা ও রাজন্যবর্গের একটি গৌরবের বিষয় ছিল। এই সকল রমণীগণ অনেকসময়ে পাণ্ডিত্যাদি বহু সদ্‌গুণে খ্যাতিসম্পন্না ছিল। গ্রীসেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এথেন্সের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসের রক্ষিতা পণ্ডিতা এসপাশিয়ার নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।